

মাটি

তারাকঙ্কর বন্দোপাধ্যায়



ডি, এম, লাইব্রেরী

৪২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রকাশক :

শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২নং, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ

মূল্য—২১

৪৬১, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা কালী-গঙ্গা প্রেস হইতে
কে, কে, ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত

মাতি

উত্তর কলকাতার অধিবাসীদের অন্তত সিকি লোক লোকটিকে বোধ হয় চেনে, অর্ধেক লোক ওর কণ্ঠস্বর শুনেছে এবং শুনেলেই চিনতে পারে —এ সেই কণ্ঠস্বর। বোল আনা লোকই ওর কণ্ঠস্বর চেনে বলতে বিধা করতাম না, কিন্তু মধ্য-দ্বিপ্রহর ছাড়া অল্প কোন সময়ে লোকটির হাঁক শোনা যায় না। মধ্য-দ্বিপ্রহরের একটা অবসাদ আছে, মহানগরীও কিছুক্ষণের জন্ত পাখীর রাজ্যের মত বিমিশ্রে পড়ে। রাজপথে লোক বিরল হয়, ট্রামে বাসে সিট খালি পড়ে, গতিও যেন মন্থর হয়, ড্রাইভারের হাতের মুঠি বোধ হয় আলগা হয়ে আসে : দোকানে খরিদার কমে যায়, কর্মচারীরা কেউ পেন্সিল ঠোঁটে চেপে জনবিরল পথের দিক্‌শূন্যে চেয়ে থাকে, বসে বসেই অনেকে ঘুমোয়, আপিস-অফিসেও এ সময়টার কাজকর্ম ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, টেলিফোনের গিসি তার তুণে লাড়। পেতে দেবী হয়, ফুটপাথে জুতো-পালিশ ও লারাও তোলে বিমোয় : বাড়ীতে দরজা বন্ধ থাকে, মেয়েরা হয় ঘুমোয় নয় আন্তে ধীরে কিছু বোনে বা সেলাইয়ের কল চালায়, রেডিয়োতে গান বক্তৃতা বেজেই চলে ; এ সময় আকাশের দিকে তাকালে কচিং হু'একট। চিল বা শকুন উড়তে দেখা যায় নইলে আকাশটাও খাঁ-খাঁ করে ; আমার পাশের বাড়ীতে আছে একটা এ্যালশেপিয়ান, সেটাও এ সময়ে চোখ বন্ধ করে জিত বের করে হাঁকায়, তার মাথার উপরে বারান্দার কড়িতে পায়রা-

মাটি

শুলো পা ভেঙ্গে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে থাকে, কিন্তু কুকুরটা ধরবার অস্ত্র লাকার না। পথে বাবার পড়ে থাকে, কাক দেখা যায় না।

এরই মধ্যে অকস্মাৎ উত্তর কলকাতার কোন-না-কোন পথে বা গলিতে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে—মাটি চা—ই, মা—টি।

কণ্ঠস্বরই শুধু তীক্ষ্ণ নয়, লোকটির হাঁকের ভক্তিও বিচিত্র, শেষের মাটি শব্দটার ‘মা’ পর্যন্ত চীৎকার করে হেঁকে ‘টির শেষে হুসইটাকে বেপদায় খাদে নামিয়ে ধের তাব প্রতিক্রিয়া হয় অদ্ভুত, সমস্ত শরীরের স্নায়ুশৃঙ্খলী কেমন যেন চমকে শিউরে ওঠে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে এই বিচিত্র ভঙ্গিমায় উচ্চারণে স্নায়ুর উপর ধ্বনির প্রভাব সার্বজনীন কি না জানি না, তবে আমি এ প্রভাব অনুভব করেছি এবং আমার বাড়ীর একটি শিশুকে চমকে উঠে ঠোঁট ফুলাতে দেখেছি। গ্রীষ্ম-বিপ্রহরে আমার ঘুমের আমেজ ভেঙে গিয়েছে, বন্ধ-ছয়ার জানালা স্বচ্ছকার ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঘুম ভেঙে কতাবিন মনে হয়েছে—আমি শুয়ে আছি আমার দেশের বাড়ীতে, বাড়ীর পিছনেই তালগাছেরা খিড়কীর পুকুরের কোন তালগাছের মাথায় বসে রোদশ্রান্ত চিল তীক্ষ্ণ করণ সুরে ডাকছে চি-লো-চি-ল-অ। শেষে অকারটা ঠিক এমনি বেপদায় নরম সুরে নেমে এসে থেমে যায়। চিলটার ঠোঁটের নীচে গলার কাছটা ধুক ধুক করে কাঁপে।

উত্তর কলকাতার বাসা করার প্রথম সপ্তাহেই ওর ডাক শুনেছিলাম। তখন বৈশাখ মাস। মনে আছে বাসা পেতেছিলাম ৬ই বৈশাখ। গলির মোড়ে সেদিন ওর হাঁক উঠতেই দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়িলাম। খা-খা করছে গলিপথ, পিচের উপর মোটর-টারারের ও নালমারা জুতোর ধাগ ফুটে উঠছে, বাতাস বলসাহেব, বাড়ীর গায়ে এক টুকরো কোনোচে জায়গায় একটা কনকটাপাগাছের লম্বা পাতাগুলি

মাটি

অবসর হয়ে বুলে পড়েছে। আকাশের দিকে চোখ তোলা যায় না, হাপর থেকে বের করার করেনক মুহূর্ত পরে মৌল হয়ে বাওয়া ধাতুপাত্রে মত উত্তাপ বিকীর্ণ করেছে। সে উত্তাপ চোখে এসে লাগছে। এরই মধ্যে ওর এং হাঁক উঠছে—মাটি চাই মাটি-ই।

তাকিয়ে রইলাম পথের দিকে। আবার হাঁক উঠল—মাটি চাই—মাটি-ই। হাঁকটা এবার দূরে চলে গেল।

মাটি চা—ই মা—টি—ই। এবার আবও দূরে। বাকের ওপারে আমাদেব গলি থেকে একটা অত্যন্ত অপ্রশস্ত গলি একে বেকে চলে গেছে দক্ষিণমুখে, সম্ভবত লোকটা সেই গলিপথে ঢুকে চলে গেছে। কিন্তু লোকটার কঠোর, তার ওই হাঁকের বেরা সমাপ্তি সমস্ত মনটাকেই শুধু অবস্থিতে ভবে দিয়ে গেল না, শরীরেও একটা চকিত চাক্ষু্য বহিয়ে দিয়ে গেল।

কিছুদিন পর ওকে দেখলাম। সেদিন ছপুয়েই বেরিয়েছিলাম কাজে। কড়েপুকুর স্ট্রীটে ঢুকে খানিকটা অগ্রসর হতেই ওই তীক্ষ্ণ কঠোরের বেরা হাঁক কাছেই কোথায় ধ্বনিত হয়ে উঠল। এক মুহূর্তে যে কোতূহল স্তিমিত হয়ে পড়েছিল সে দীপ্ত হয়ে উঠল, ওই হাঁকটা যেন কুংকার দিয়ে আগিয়ে তুলল—দপ্ করে আগিয়ে দিল। দিক অনুমান করে এগিয়ে গেলাম।

—মাটি চা—ই মা—টি—ই।

ধমকে দাঁড়ালাম। হাঁকটা পিছনে পড়ে গেছে। পিছন কিরলাম, দেখলাম পিছনে একটা পাশের গলি থেকে মাটিওলা বেরিয়ে

মাটি

আসছে। বিচিত্রদর্শন উলঙ্গপ্রায় মানুষ। পরশে শুধু একটা নেংটি ;
 সর্বাঙ্গ কাছায় আবৃত। সন্ন্যাসীরা যেমন ভয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করে
 তেমনিভাবে কাছায় মাথা লোকটির সর্বাঙ্গ। সমরটা তখন বোধহয়
 আষাঢ় মাস। রৌদ্রের প্রখরতা বৈশাখের চেয়ে কম নয়, উপরন্তু
 ঝাঝালো, সঞ্চারিত হয়েছে সজলম্পর্শ, মাটিও হয়েছে সরসগন্ধ, তার
 কলে একটা গুমোট তাপানিতে ভরে উঠেছে বাংলাদেশ, আলার
 বদলে ঘেমে মানুষ সারা হয়ে গেল। লোকটির গারের ধূলা কাঁদা হয়ে
 উঠেছে, সেই কাঁদা ঘামে গলছে। ঘামের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে
 দেহখানাকে যেন বিচিত্রিত করে তুলেছে। আমি অবাক হয়ে ওকে
 দেখলাম। কাঁদা এবং ঘামের ধারার রং ও রেখার বৈচিত্র্য নয়—অবাক
 হলাম লোকটার দেহের গঠনবৈচিত্র্য দেখে। একজন সুস্থ নহজ
 মানুষের দেহ এমনভাবে বিকৃত হয়ে যায়। লম্বা একটি মানুষ বোঝা
 বয়ে খাটো হয়ে যায় এমনভাবে ৭ পা থেকে কোমর পর্যন্ত শরীরের
 নীচের দিকটা সহজ স্বাভাবিক সরল সোজা পা, প্রতিটি পেশী সুগঠিত,
 কিন্তু উপরের দিকটা—কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত অংশটা বিপুল চাপ
 দিয়ে কেউ যেন দেহের কাঠামোটা পর্যন্ত ভেঙে চূরে বিকৃত করে খাটো
 করে দিয়েছে। চওড়া বুকটা উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে; পেটটা গিয়েছে
 ভিতরে ঢুকে—সেখানে দড়ির মত গোটা তিনেক পেশী দাঁড়িয়ে গেছে,
 সেগুলি এখন ঘন স্বাস প্রাশাসে কাঁপছে। ঘাড়ের মাটির বস্তুর জন্ত
 ওর মুখখানা আমি দেখতেই পাচ্ছি না, মাটির দিকে মুখ করে লোকটা
 হেঁটে চলেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি ওর মাথার একটা দিক; কদমফুলি
 ছাঁটে ছাঁটা কাঁচা-পাকা চূলে ভরা প্রকাণ্ড মাথাটার একটা দিক।
 একটু দ্রুত হেঁটে এগিয়ে গেলাম। এবার নজরে পড়ল—কাছার

এলপের মধ্যে দেখতে পেলাম—ছোট বড় কাটা দাগ,—সংখ্যার অনেক ।

একটা বাড়ী থেকে কেউ ওকে ডাকলে—এই মাটিওলা ।

লোকটা খুল লেই দিকে ; আমি তার পিছনে গড়লাম । এবার আমার বিশ্বয় উঠল চরমে । বাড়ের নীচেই একটা কুঁজ ।* কুঁজের উপরে একটা খাঁজ তৈরী হয়ে গিয়েছে, তারই উপরে মাটির বস্তা চাপিয়ে লোকটা ভারী-পায়ে পা ফেলে ; কিন্তু চলার ভঙ্গি সহজ—কাঁধে ভার চেপেছে বলে দ্রুত চলছে না, বেশ সহজ চালে চলছে । মাটির বস্তা বয়ে বাড়ি ওর খাঁজ তৈরী হয়েছিল—ওর সবল সহজ দেহ ভেঙে-চুরে পিঠে কুঁজ ঠেলে উঠেচে, বুকেটা ফুলে ঠেলে বেরিয়েছে—পেটটা ঢুকে গেছে ।

ঠিক এই মুহূর্তেই লোকটা বাড়ের বস্তা দাওয়ার উপরে নামিয়ে মাটি বেচতে বসল । যুক্তি ও অনুমানের দিক থেকে আশ্চর্য হবাবু কথা 'নয়, তবুও আশ্চর্য হলাম, যুক্তি এবং অনুমানের শক্তি বোধহয় পছন্দ হয়ে গিয়েছিল আমার । বাড়ের বস্তা নামিয়ে ও লোকটি সহজ মানুষের মত সোজা হতে পারলে না । বাড়ি ধেকেই রইল—পিঠের কুঁজটা তেমনি উঁচু হয়েই রইল—শুধু মুখটা একটু তুললে মাত্র । নির্বোধ মানুষের মুখ-চোখে স্থল দৃষ্টি, কিন্তু একটি সুন্দর মানুষের মুখ । মুখের গড়নে বড় বড় চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটি শান্ত মধুর সুন্দর মানুষের সন্ধান বিশ্ববিজ্ঞাপনের মত যেন ফুটে রয়েছে । বিস্মিত এবং বেদনাক্লান্ত হয়ে কতক্ষণ তাকে দেখেছিলাম, সেকথা আজ মনে নেই, অনেক চিন্তাও মনের মধ্যে উঠেছিল, এই যুগের চিন্তাই সে সব, কিন্তু তাও সব আজ স্পষ্ট নয়, পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থাকে অভিসম্পাত দিচ্ছেলাম, কোটা

মাটি

কোটি মানুষকে এইভাবে যারা বঞ্চিত করে রেখেছে শিক্ষা থেকে, সম্পদের ভাষা অংশ থেকে, তাদের ধ্বংসকামনাও করেছিলাম—এতে কোন সন্দেহ নেই। আরও অনেক কথা মনে হয়েছিল; সে সব মনে পড়েছে না আজ। না পড়ুক। তবে এব পর যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস কেলে চলে গিয়েছিলাম, তা আজও মনে পড়েছে। শুধু তাই নয়, ঐ দিন থেকে ওর সঙ্গে আমার মনের একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সম্পর্কই স্থাপিত হয়ে গেছে; যখন মনে হয় ওর কথা—যখনই শুক দুপুরের অবসর অবসরে ঘুরে হোক—কাছে হোক—নগরীর পথে ওর ডাক শুনতে পাই, তখনই একটি দীর্ঘনিশ্বাস আপনি ক'রে পড়ে বুক থেকে; শত ব্যস্ততা অথবা একাধি চিন্তার মধ্যেও কয়েক মুহূর্তের জন্য সব ভুলে গিয়ে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। শীতের অরণ্যগর্ভ থেকে ঘনিয়ে-ওঠা কুয়াশা যেমন বনস্পতির পত্র-পুষ্পের স্বর্ধারাদনাকে আচ্ছন্ন আবৃত করে তেমনি ভাবেই একটি উদ্বাসীনতা আমার মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠে সচেতন মনের সকল উত্তমকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়।

এর পর কতবার ওকে দেখেছি, বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, বাগবাড়ায়, বউবাড়ায়, পোস্তা, টালা, বেলবাটার—ঠিক এমনি দ্বিপ্রহরে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেছি; তীক্ষ্ণস্বরে ওই বেসুরা ভঙ্গিতে ওর হাঁক ভেসে চলেছে—মাটি চাই—মা—টি—ই।

সবদিন দেখতে পাইনি। অমূল্যের স্পৃহা আব নাই। দু'এক দিন চোখে পড়েছে। ঘুরে পড়া ঘাড় এবং ঠেলে ওঠা পিঠের কুঁজের মধ্যবর্তী খাঁজে মাটির বস্তা বয়ে বিকলাঙ্গ মাটিওরাদা সর্বাঙ্গে কাঁদা মেখে হেঁকে চলেছে—মা—টি চা—ই, মা—টিই!

মাটি

করেক দুহুর্তি দাঁড়িয়ে পেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছি আমি ।
তারপর চলে গেছি নিজের পথে ।

* * *

হঠাৎ সেদিন নিতান্ত মসময়ে—একেবারে ভোরবেলা অপ্রত্যাশিত-
ভাবে ওর বাসাও আঁবিকার করলাম । লবে তখন গ্যাসের আলো
নিভেছে, বাস্তায় তখনও জল পড়েনি ; আমি অভ্যাসমত প্রাতঃস্নানে
বেবিয়েছিলাম ; বেড়াবার বাঁধাধরা স্থান ছিল পার্ক অথবা গঙ্গার ধার ;
সেদিন দিকপরিবর্তন করে চলে গেলাম একেবারে খালের ধারে ।
খালের পোল পার হয়ে গেলাম গঙ্গা এবং খালটার সংযোগস্থলের গেটটার
দিকে । পাম্প লাগিয়ে খালের জল মেরে ফেলা হচ্ছিল, খালটা মজে
এসেছে, সংস্কার হবে । কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে হুঁধার বেগে
উঠেছে ; জল পড়েছে মাঝখানে, তার মধ্যেও মাঝে মাঝে পাঁক দেখা
যাচ্ছে । পোল পার হয়ে খালের পারে ধারে চলেছিলাম । গঙ্গার ওপারে
জুট মিলের ইয়ার্ডে এখনও আলো জ্বলছে । হঠাৎ দেখলাম মাটিওলাকে ।
হুয়ে পড়া বাড়, পিঠে কুঁজ, ঠেলে ওঠা হুক...দেখে গমকে দাঁড়িয়ে
গেলাম । গঙ্গার স্নান করে একথানা গামছা পরে হাতে একটা জলের
ঝটি নিয়ে ফিরছে । আমি থমকে দাঁড়াত্তেই মাটিওলা সবিস্ময়ে আমার
মুখের দিকে চাইলে । তারপবই প্রশ্নর বিনয়ে হেসে বললে,—আজ্ঞা
হী, আমি সেই মাটিওলাই বটে । ভাঙা ভাঙা বাংলার হিন্দি মিশিরে
কথাটা বললে,—হী, ওহি মাটিওলাই আছে হামি বাবুজী । বেন স্নান
ক'রে পরিছন্ন দেহে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বেচারী লজ্জা পেরেছে ।

মাটি

আমি প্রশ্ন করলাম—কোথাও বাবে বুঝি আদ্য ?

তার দুল দৃষ্টিতে বিষয় বেগে উঠল আমার প্রশ্নে। বললে—আঁ ?
বারেগা ? কাঁহা বারেগা ?

—আদ্যান করে এলে—এই ভোরে—

—হাঁ। এখন রামজীর নাম নোব, উলকে বাদ—ছোটো চানা খেয়ে
নেব, তারপর চলগা মিটি আনতে। আচ্ছা বাবুজী রাম-রাম।

—রাম-রাম ভেইয়া।

সে চলতে শুরু করে দিলে। কয়েক পা গিয়েই কিছু ফিরে দাঁড়িয়ে
বললে—খোকী ভাল আছে বাবুজী ? আপনার লেড়কী ?

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ওর কথা। আমার বাড়ীতে তো
শুকী নাই।

—আপনের খোকী ! আপ তো বেলিয়াঘাটামে রহেতে হ্যার ?
লাল রঙের কোঠা ?

বুঝলাম, ও আমাকে বেলিয়াঘাটার কোন লাল রঙের বাড়ীর বাসিন্দে
বলে ভুল করেছে। কিন্তু প্রতিবাদ করলাম না। ওরই ভুলের মধ্য
দিয়ে পরিচয়ের সুযোগ নিতে চাইলাম। বললাম—হ্যা ভালো আছে।

বুখ ভরে হেসে সে বললে,—আমি গেলেই ছুটে আসবে। একটি
খোলাভাঙ্গা বাড়িয়ে দিয়ে বলবে—এক পরসার মাটি দেও—মাটিওলা।
হামি বলে—কি হোবে খোকী ? বলে—চুলহামে মাটি দেনে হোগা,
মাটিওলা। ছোটো হাতমে একমুঠি মাটি—বাস চলা বারে গা।

এবার সে হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর বললে—হ্যারসা
দেখতা হ্যার না—ওইসাই—ঠিক ওইসাই করগা উ লোক।

ছোট্ট একটি গিন্নী মেয়ের ছবি আমার চোখেও ভেসে উঠল।

অস্তর ভরে উঠল অনাবিল প্রসন্নতার। সে এবার খটখট হাত তুলে
আমাকে নমস্কার ক'রে বললে—আব যাতা হার বাবুজী! হাঁ রাম
রাম।

চলে গেল সে। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইলাম তার দিকে চেয়ে।
খালের এপারটা অপরিচ্ছন্ন, প্রাচীন আমলের ভাঙ্গা বাড়ী, কতী, গোলা
আর শুধামে ভর্তি। আবজ'না এবং আগাছার জলজের মধ্য দিয়ে চলে
গেছে বস্তীর পথ। সেই পথে চলে গেল সে।

* * * *

আবার কয়েকদিন পব ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। এবার
দেখা হওয়ার পটভূমি একেবারে কল্লনার বাইরে। গিরেহিলাম
পোষ্টাপিসে, পোষ্টাপিসে একটা লম্বা কিউয়ের মধ্যে দেখি মাটিওলা
দাঁড়িয়ে আছে। পোষ্টাপিসে ওকে কিউয়ের মধ্যে দেখবার প্রত্যাশা
যেন কল্লনার বাইবে। বৃহত্তের জন্ত আমার কপাল কখনেরখার ভরে
উঠল। পরবৃহতে নিজেই একটু হাসলাম, ওরও বেশ আছে, ঘর-সংসার
আছে, ইটে কাঠে পাথরে মাটির ধলাকে ঢেকে যে মহানগরী গড়ে
উঠেছে, তারও ঘরে ঘরে মাটির প্রয়োজন হয়; ওই শিক্ষার দীক্ষার বক্তিত
মাটিওলা—ওরও প্রয়োজন হয় ডাকঘরে, এতে বিশ্বয়ের কি আছে?
কিউটা মনিজ্ঞারের ঝকউ। টাকা পাঠাচ্ছে বেশে। সঙ্গে সঙ্গে
কৌতুহল উজ্জ্বল হয়ে উঠল—যুমন্ত বাড়ীর খোলা দরজার সম্মুখে
চোরের উঁকি মেয়ে দেখবার প্রবৃত্তির মত। কাছে গিরে দাঁড়িলাম।
ও আমার মুখের দিকে চাইলে, চোখে দুটে উঠল অপরিচয়ের বিষয়;

মাটি

শক্তিও হ'ল বোধহয়, কারণ গামছার খুঁটটা শক্ত মুঠোর চেপে ধরলে।
বুললাম, একেবারে ভুলে গেছে আমাকে। সেদিনেব খোকীর গল্পটা
মনে পড়ে গেল। বললাম, পছানতে নেহি?

নির্বোধের মত উত্তর দিলে—আঁ।?

হেসে বললাম—সেদিন তোমার সঙ্গে খালধারে দেখা হয়েছিল!
বেলোষাটার খোকী—মাটি কেনে তোমার কাছে—!

আম্বাসের হাঁসিতে ওর নির্বোধ মুখখানি ভরে উঠল, বলল—হাঁ—
হাঁ। কাল গয়া যা আপনাকে কোঠীমে। খোকী কাল হামাকে
নেওতা দিয়া।

হেসে আমি বললাম—দেশে টাকা পাঠাবে?

—হাঁ। দেশমে রূপেয়া ভেজবে।

—এ তো অনেক দেবী হবে। এস আমি তোমার মনিঅর্ডার
তাঁড়াভাঙ্কি করিয়ে দেব। আমার সঙ্গে আলাপ আছে মাষ্টাববাব্বর।

—হাঁ! সে অবাক হয়ে গেল আমার প্রতিষ্ঠা দেখে।

—কই, দেখি তোমার মনিঅর্ডার।

একখানা সাদা ফর্ম আমার হাতে দিয়ে সে বললে—তা হ'লে তুমি
এটা লিখে দাও বাবুজী। খুসী হয়েই বাইরে একটা দাওয়ার উপর বসে
গেলাম ওকে নিয়ে।

—লিখিয়ে বাবুজী! রূপেয়া দশঠো। পানেওলী—লছমনিয়া,
অকলু দুশহরকে বিটীয়া। আমি লিখতে সুরু করে ওর নামগুলি
প্রব্বের সুরে বলে গেলাম, ভুল হলে সংশোধনের সুযোগ পাবে।

—লছমনিয়া

—হাঁ।

—অকলু মুসহরকে বেটা

—হাঁ। গাঁও.....। গঙ্গাজীর কিনারমে জাহাজী টিশন।

গাঁও পোষ্টাপিস মনে নাই আজ, মনে আছে বিলা পটুনা’।

তারপর বললাম—অব্ তুমাহারা নাম-পতা বোলো।

—হাঁ। লিখিয়ে, মেওয়ারাল।

—মেওয়ারাল মুসহর ?

—নেতি নেহি। মাটিওলা লিখিয়ে।

—দাচ্চা। হাসলাম একটু। বাতাও উসকে বাদ। পত্তা বাতাও।

বলে গেল ওর ঠিকানা। বিচিত্র বস্তীর সে ঠিকানা।

—অব্—কেরা লিখনে হোগা বাতাও।

—কুচ্চ না।

—কুচ্চ না ? ইসমে লিখনে কা জাজা হার, লিখনে কু একতিয়ার ভি হায়—

—নেহি—নেহি—কুচ্চ না। নেহি—নেহি।

সে প্রতিবাদ জানালে। কিছু না। কিছু লিখতে হবে না। আমি ওব মুখের দিকে চাইলাম। ও তখনও ষাড় নাড়ছিল। আমার চোখে চোখ পড়তেই একটু হাসলে, বিচিত্র সে হাসি। তারপর বললে—আজকের দিনটাই আমার মাটি বাবুজী। কোন কাজ হ’ল না। বাহিনাব পহেলা দৌজ আমরা এই কাজেই দার বাবুজী ! মহাবীর কাহারের মা বলে—বরবাদ বরবাদ করিস দিনটা তুই মেওয়ারাল।

মাটি

পরের মালের পরলা তারিখটা বিশেষ করে খেয়ালে ছিল। মাটিগুলার জন্ত নয়, তারিখটিকে স্মরণীয় করে তুলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমার সংসারে আবির্ভূত হ'লেন—এক দৌহিত্রী। খাজী ডাক্তার এঁদের বিদায় ক'রে ডায়রীতে লিখছিলাম নবজাতার জন্মের তারিখ, সময় ইত্যাদি। ১লা অগ্রহায়ণ.....। হঠাৎ খোলা দরজার এনে দাঁড়াল মেওয়ালাল মাটিওলা। আমি বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকলাম। আমার বাড়ী ও চিনলে কেমন করে।

একগাল হেসে মেওয়ালাল বললে—পরগাম বাবুজী।

—রাম রাম ভাই।

—আপকা কোঠী হম পছন্দান লিয়া বাবুজী! সে হাসতে লাগল। বললে—বেলিয়াঘাটা তোমার বাড়ী নয়। যো রোজ তোমার সঙ্গে পোষ্টাপিসে দেখা তার পরদিন আমি তোমার অন্ত্রে বহত আচ্ছা গঙ্গাজীর মাটি নিরে তোমাকে ভেট দিতে গিয়েছিলাম। টবে ওই মাটি দিয়ে গাছ লাগালে আচ্ছা গাছ হবে। কিন্তু গিয়ে একদম বুডবুক বনে গলাম। মালিক, ওহি ধোকীব বাপ, ধোকীর হাত ধবে দাঁড়িয়েছিল দরজার। আমি বাবুজী ওহি বাবুজীকেই বললাম—মালিকবাবুকে একটু ডেকে ঘেরে ছজুর? এই ধোকী মারীর পিতাজীকে? বাবুজীকে সোসনা হো গিয়া, আরে—বাপরে বাপ! আঁখ পাকাকে—বলব কি বাবুজী—বলে—কেয়া কাম হ্যায় তুমহারা? ধোকীকে পিতাজী ভো হম হ্যায়। হায় রামজী! হম একদম বেওকুক বর্ন গেরা।

আমি নিজেও একটু অপ্রতিভ হলাম। এইবার যদি ও আমাকে প্রলম্ব করে বাবুজী, তুমি এমন মিথ্যে পরিচয় কেন দিলে আমাকে?—ভবে আমি কি উত্তর দেব। সত্য উত্তর মেওয়ালাল কতখানি বুঝবে?

হঠাৎ মনে এসে গেল, আমিও তাই বলে বললাম—আমি তোমার সঙ্গে জুয়াচুরি কিছু করি নি যেওয়ালাল। মনিঅর্ডারের রসিদ পেয়েছ তুমি ?

—হাঁ—হাঁ—হাঁ। বারবার স্বীকার করতে চাইলে বেন কথাটা শুধু বাক্যে নয়—বাড় নেড়ে লর্বাঙ্গ দিয়ে স্বীকার করলে বেন। এর পর অপরাধীর মত হেসে বললে—তোমার কাছে আমার কনুই আমি লুকাব না বাবুজী। প্রথম দিন—বেলিরাবাটার বেদিন দেখলাম খোকার বাপ তুমি নও, সেদিন আমার বহুত ডর হয়েছিল। মনে হয়েছিল বাবুজী, কি কোন জুয়াচোর হয়তো আমাকে ঠকিয়ে দশ দশঠো টাকা আমার ঘেরে দিয়েছে। মনিঅর্ডারকে বিল্টি যেঠো আমাকে দিয়েছে, সেটা হয় তো একদম ভুয়া হবে। পোষ্টাপিসে কি খুটখুট বলে একটা বাজে কাগজ আমাকে দিয়েছে। বাবুজী, বেলিরাবাগে একদম দৌড়কে-দৌড়কে বসোমে ফিরলাম। বিল্টি নিয়ে ছুটে গেলাম একঠো ডাকডরখানামে। ডাগডর বাবুকে বললাম—দেখিয়ে তো হজুর—ডাগডর সাব, কেয়া লিখা হয় হ্যায় ইস বিল্টিমে ? মেহেরবাণী ক'রে গরীবকে বলে দাওতো গরীব পরবর ! তা ডাগডর সাব পড়লে—দেখলাম—ঠিক ঠিক নাম আগর পতা লেখা রয়েছে। ডাগডর আরও বললে—বিল্টি ঠিকঠাক আছে—ডাংখানার মোহর আছে—মাষ্টারবাবুকে সহি ডি আছে। খানিকটা ভরসা হল। তবু বাবুজী—পুরা ভরসা পাইনি। রাতে ঘুম হ'ত না। ভাবতাম—কলকাতার জুয়াচুরি—একঠো আগর মোহর বানাতে আর কি লাগে ? তারপর একদিন রসিদটা কিলে এল। যেমন সঙ্গে সঙ্গে একঠো খত ডি আলে—তাও এল। তখন বারবার মনে মনে বললাম—নীয়ারামজী—বাবুজীর কাছে আমার কনুই হ'ল—এ পাপের আমি কি করি ! তারপর একদিন তোমার বাসা দেখলাম।

মাটি

দেখলাম বহুত ভারী বাবু আমীর লোকের সঙ্গে তুমি কথা বলছ। আবাবর এক রোজ দেখলাম সাহেব লোগ বসে আছে তোমার কাছে। দুই থেকে উঁকি মেরে দেখে ফিরে গিয়েছি। আজ ফিন মাহিনাকে পহেলা রোজ বাবুজী—তুমি আমার মনিঅটারঠো লিখে দ্যাক, আর যদি লেখিনের মত জলদি করিয়ে দাও বাবুজী—

মেওয়ালাল হাত জোড় করে দাঁড়াল। আমিও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সহজ সরল মানুষ—তাই এত সহজে ওর সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। নইলে এই মিথ্যা পরিচয় দেওয়ার পর এ সন্ততাকে বড়রকমের জুরাচুরির ভূমিকা ভাবতে বাধ্য কোথায় ছিল।

বললাম—দাঁও ফর্ম। কি নাম যেন? লছমনিয়া—না?

—জী। লছমনিয়া, অকলু মুসহবকে বিটীয়া।

* * * *

লছমনিয়া—অকলু মুসহবকে বিটীয়া—'বাড়ী পাটনা জেলার একটা গ্রামে একেবারে গঙ্গাজীর কিনাবার উপর।

মেওয়ালালের সঙ্গে সেদিন আলাপ জমে উঠল। মেওয়ালাল বললে—বাবুজী যে লোক—ডেকে আমার দুঃখের লাঘব করে দিলে; আমীর আদমী, লিখাপড়া জানা লায়েক আদমী হয়ে আমার মত গরীব মাটিওলার সঙ্গে এমন মিষ্টি কথা বললে—তার কাছে কি কিছু লুকুতে আছে? তোমার কাছে বলি। মনের কথা আমার ছনিয়ায় বলবার লোক পাই না। বহুত রোজ আগে—বলেছিলাম এক সাবুজীর কাছে। গঙ্গাজীর কিনায়ায় এসে একঠো মন্দিরের দাঁওয়ার আসন গেড়েছিলেন

—তাকে বলেছিলাম। আর বলেছিলাম—মহাবীর কাহারের নাকে, আমাদের বস্ত্রীতে থাকে বুঢ়িয়া, সে আমাকে ভালবাসে আপন বেটার মত; একবার ভারী যেমারী হয়েছিল আমার—ওহি বুঢ়িয়া আমাকে বাঁচিয়েছিল—তাকে বলেছিলাম। আজ তোমাকে বলি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেওয়ালাল। বাইরে শীতের বরফের হাওয়া বইছে। বাড়ীর পাশের চাপাগাছের পাতা করে পড়েছে যে হাওয়ার।

“মুসহরের বেটি লছমনিয়ার যে গাঁয়ে বাড়ী—ওই একই গাঁয়ে রতনলাল নামে এক।.....” বলতে গিয়ে থেমে গেল মেওয়ালাল। একটু ঘেন সামলে নিয়ে বললে—বাবুজী—রতনলাল নামে একজন খুব ভাল লোক ছিল। লোকে বলত মুন্সীজী। লিপাপড়ি জানত, গোস্বামী মহারাজ তুলসীধাসেন বামচরিত স্পষ্ট পড়ত। গরীব গৃহস্থী; ধরে দুতিনটে গাহ ছিল—একটা ভঁইসা ছিল, একছোড়া বয়েলও ছিল, আর গঙ্গাজী কিনার পাঁচ বিঘা ক্ষেত। তারই ছেলে আমি—আমার নাম ‘জীওলাল’; ওই অকলু মুসহরকে বিটীয়া—লছমনিয়া আমার নাম দিয়েছিল—মেওয়ালাল। অকলু মুসহর আমার বাপের ক্ষেতিতে কাজ করত—কিবাণ মজদুর ছিল। গাহি মঁহব বয়েলের সেবা করত ওর বেটী। ওই লছমনিয়া ছেলেবেলা থেকেই আসত আমাদের বাড়ী। পাটকাম করত, কুটাবত্ন মলাই করত। ওরও মা ছিল না, আমারও না ছিল না বাবুজী, ছেলেবেলা একসঙ্গে খেলা করতাম আমরা।

রতনলালকে লোকে বলত মুন্সী মানুষ। করের সঙ্গে বগড়াবাট্ট ছিল না। গাঁয়ের লোক লভ্রম করত। ক্ষেতিতে গঁহ, বব, অড়হর হ’ত প্রচুর। ছেলে মেওয়ালাল বার-চৌদ্দ বরষ উমর থেকেই এমন ক্ষেতি

মাটি

কায় শিখেছিল আর ওই ক্ষেতি নিয়েই চকিশ বণ্টা। এমন ষাটতু বে, ছ'তিনখানা গাঁয়ের মধ্যে এমন বড়িয়া 'ক্ষেতি' আর কাকর ছিল না। তাতে আর আশ্চর্য কি বাবুজী! একজন লোক যদি বারো মাহিনা তিরিশ রোজ ওই ক্ষেতিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা ইন্তুকু বুক দিয়ে পড়ে থাকে, এক কণা খাস বের হলে টেনে তুলে মাটিতে পুঁতে দেয়—যাতে খাসও যায় আবার জমিও হয় আরও উর্বর; ছ'হাতে গঙ্গার কিনারার দ্বিয়ারা ক্ষেতির মাটি ঘেঁটে ঘেঁটে সামান্য 'কঙ্কর' কি 'পথল' থাকলে বেছে কেলে দেয়; পথে ঘাটে এতটুকু গোবর দেখলে কুড়িয়ে এনে ওই 'ক্ষেতি'তে ঢালে; খুরগী আর কোদালি নিয়ে হরদম জমির তরিবত করে, তবে ঐ ক্ষেতির সঙ্গে পাল্লা দিতে অল্প ক্ষেতি পারবে কেন? বাবুজী—ছনিয়াতে সকল মায়ের বুকেই ক্ষীর আছে, কিন্তু যে মা পেট ভ'রে খেতে পার, ভাল মেওয়া চিচ্ছ খার—সে মায়ের বুকের ক্ষীরের পরিমাণ আর গুণের সঙ্গে অল্প মায়ের বুকের ক্ষীরের পরিমাণ আর গুণ সমান হয়, না—হতে পারে?

একটু থামলে মাটিওলা। আমার মুখের উপর দৃষ্টি তুলে মিষ্টি হাসি ছেলে বললে—অকলু মুসহরেব বেটা লছমনিয়া এই কথা শুনেই আমাকে ঠাট্টা ক'রে বলতো—মেওয়ানানেওয়ালী জমিনকে মালিক তুমি—তোমার জমিনমে যে কসল হয় তার মধ্যেও মেওয়ার পোষ্টাই—ওহি মিরে তোমার নাম দিলাম আমি মেওয়ালাল।

তখন মেওয়ালালের বরস হবে বোল-সত্তের, ফুল ধরবার আগে গছ কি যবের কসল যেমন লকলকে তেজালো ঘন সবুজ হয়ে ওঠে তেমনি তখন মেওয়ালালের চেহারা। ক্ষেতিতে খেটে খেটে আর কুন্তী করে গঙ্গাজীতে সাতার কেটে গারে জোরও হয়েছে তেমনি। ছনিয়াতে

কারিগর পরোয়া করে না। কিন্তু লছমনিয়ার এই ভাষাসার কেমন সরম লাগত। লছমনিয়া হেসে বলত—আরে বাপরে, গাল কপাল যে আনারের দানার মত টসটসে লাগ হয়ে উঠল। এ একেবারে খাস মেওয়ারাল তুমি।

লছমনিয়া মেওয়ারালার চেয়ে বরষে বছরখানেকের বড়ই হবে। তেমনি কি তার চেহারা! বেধে মনে হ'ত পাঞ্জাব দেশের রহনেওয়ারী। এই লম্বা বাবুজী। বাঁশীর মত নাক, পাঞ্জাবী মেয়েদের মতই চোখ ছোট ছোট। গানের রঙ কিন্তু কালো। মেয়েটাকে সুসহররা বলত 'সাপিন্দ'। সাপিনের মতই লম্বা—তেমনি চোখ—চেহারাতেও যেমন—ভাগ্যের দিক থেকেও তাই;—ছেলেবেলার বছর তিনেক বয়সে হয় সাবী, বছর না পেরুতেই বর মারা গেল; তারপর দশ বছর বয়সে হ'ল প্রথম সাগাই—বাবুজী এক মহিনা যেতে-না-বেতে সে স্বামীও মারা গেল, তারপর ফের সাগাই দিলে ওর বাপু—তখন ওর বয়স ষারো। সে এক আশ্চর্য কাণ্ড—ওই সাগাইয়ের রাত্রেই বর মারা গেল; ইয়াং জোয়ান, এই ছাতি, লোকটা হঠাৎ বললে—বুকটা কেমন করছে; বাসু তারপরই দু হাতে খামচে ধরলে কনের সুখ আর কাঁধ—বারকরেক গোঁ গোঁ শব্দ করে চলে পড়ে গেল। এরপর লছমনিয়াকে কেউ সাগাই করতে সাহস করলে না। বললে—সাপিনকড়া। মেয়েটাও বাপকে বললে—আবারও যদি সাগাইয়ের ব্যবস্থা কর, তবে আমি হয় বরিয়ান কাঁপ দেব, নয় তো জ্বর মানে বিষ খাব।

বাপ বলেছিল—তবে শেষে তোর হবে কি? আমি যখন মরব—
তখন—

লছমনিয়া বাপের কথার দাব্বানাই বলেছিল—তুই খাস বুড়োয়া,

নাতি

মনিববাড়ী রয়েছে বাবু জীওনলালজীর ক্ষেতি আছে, খাটব খাব। ক্ষেতে খাটবার তাগদ গেলে জীওনবাবুর নাতি হবে পুতি হবে—ওহি লোকের বিধমদ খাটব—জীওনবাবুজীর বহুজীর সঙ্গে ঝগড়া করব আর দলব আলবৎ খেতে দিতে হবে—দাও খেতে।

এর পর থেকে জোর করে সে বাপ অকলুর সঙ্গে ক্ষেতে খাটতে আসত। সমানে খেটে যেত। অকলু বসত মধ্যে মধ্যে, ক্লাস্ত হলেও বসত, না হলেও বসত, মজতুরীর নিয়ম ওটা। তাগদ তোমার যতখানি ততখানি, কখনও খাটবে না। খাটতে নাই। যা তোমার আয় তাই যদি তুমি খরচ করে দাও তবে আর তোমার থাকবে কি? তাই মজতুরেরা ঠিক এক একটা সময় অন্তর বসে জিরিয়ে নেয় খানিকটা। তবে ফুরাণের কাম যদি হয় তবে সে আলগ্ মানে আলাদা কথা। লছমনিয়া কিন্তু বসত না, সে খেটেই চলত উদয়াস্ত। বসতে বললে বাপকে বলত—বাবু জীওনলালের চেয়ে আমাকে কাম বেশী করতে হবে। আমি দেখিয়ে দেব কি বাবুজীর চেয়ে আমার তাগদ বেশী।

খিল খিল করে হাসত সে।

মাটিওলা বললে—তা' বলে মনে করো না বাবুজী কি মুসহর মেয়েটার মতলব ছিল কিছু। কি মেওয়ালালের মনে কোন পাপ ছিল। আমি তোমাকে সূক্ষ্ম নারায়ণের হলপ নিয়ে বলতে পারি যে হু'জনেরই ভিতরটা তখন সূর্যের আলোর মতই পরিষ্কার ছিল, গঙ্গাজীর পানির মতই পবিত্র ছিল। আসল ব্যাপারটা ছিল কি জান? এই যে গায়ের জোরের পান্না ধোওয়া, এটা ওদের হু'জনের সেই ছেলেবেলা থেকেই চলে আসছে। লছমনিয়া ছিল বয়সে বড়, মেওয়ালালের ছেলেবেলার সঙ্গী, ফল মাকড়—এটা ওটা—এই ধর—রঙীন কাচের টুকরো, গুঁকি

গঙ্গাজীব কিনারায় বালুর ভিতরের কিছুক—এই নিয়ে বছবার শক্তির প্রতিযোগিতা হয়ে গিয়েছে, ওটা ওদের একটা খেলা ছিল। নেহাতই খেলা।

একটু খেমে সে বাধ হর ভেবে নিলে কিছু। তারপর আবার বললে—আর জীওনলালের তখন এ সব খেয়ানই ছিল না। দেখতে অবশ্য সেও তখন জোয়ান হয়ে উঠেছে, হাতের গুলি ফুলে উঠেছে, বুকের দু'পাশে ছুখানা যেন পাথরের চাই দেখা দিয়েছে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের ঘাসের নতুন ডগার মত গোঁফ দেখা দিতে শুরু করেছে—কিন্তু ও খেয়াল জাগেনি। ওর এক খেয়াল ক্ষেত! ক্ষেত—ত আর ক্ষেত। ক্ষেত কাজ নাই তবু সে বসে থাকত খানিকটা মাটি হাতে নিয়ে—আপন মনেই পিষত—আর গঙ্গাজীব জলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখত।

জীওনলালের বাপ এতে খুসী ছিল না। তার ইচ্ছে ছিল ছেলে 'লিখপড়া' শিখে মুন্সীর কাজ করে, আদালত কি জিমিনারী কাছারী কি কোথাও কলম চালায়। কিন্তু জীওনলালের মগজ ভাল ছিল না। বাপের অনেক চেষ্টাতেও তার কিছু হয় নি, দশ বছর বয়সেই সে লেখাপড়া ছেড়েছিল—বাপও হাল ছেড়েছিল। মনে ডঃ থ থাকলেও সে কথা সে বলত না কারও কাছে। তবে জীওনলাল জামত। এই কারণেই তার বাপ ইদানীং ক্ষেতের ধার দিয়ে হাঁটে না। বসে বসে ভুলসীদাস পড়ে, পূজা অর্চনা করে, ক্ষেত থেকে ছেলে ঘরে ফিরলে একবার মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসি—হুখের হাসি—আবার কাজে মন দেয়।

জীওনলালও এতে ডঃ থ পায়। সে বুঝতে পারে না বাপের এত আক্ষেপ কেন? কি অজ্ঞান সে করছে? ডঃ থ বসে পায় তত তার

মাটি

ক্ষেতের নেশা বাড়ে। এক একদিন ধরে ফিরে বাপের ওই হাঙ্গি দেখে আবার চলে যায় ক্ষেতের দিকে। রাত্রে সে অন্ধকারেই তোক আর জ্যোৎস্নাতেই হোক বসে থাকে ক্ষেতের মধ্যে।

বাবুজী, গঙ্গার কিনারার আমীর জমিদার এরা বৃক্ষে হাওয়া খায়; গঙ্গাজীর বৃক্ষে ঢেউ ওঠে, পাল তুলে দিয়ে নৌকা যায়—ব'লে ব'লে দেখে—জ্যোৎস্না রাত্রে দরিয়ার জলে বিকিমিকি ওঠে—তাহার বাহার দেখে একদম বিভোর হয়ে যায়। তুমিও তো আমীর লোক, তুমিও নিশ্চয় দেখেছ। কিন্তু জীওনলাল ওই ক্ষেতির মধ্যে বসে গঙ্গাজীর বে শোভা বেখেছে তা তোমরা দেখনি। যে আরাম পেয়েছে সে তোমরা পাবে না।

তার চোখের সামনে চাঁদের আলো—দরিয়ার জল—এর সঙ্গে মিশে ভাসত তার ক্ষেতির ফসলের শোভা। একদম দুধবরণ জ্যোৎস্নার যখন গঙ্গাজীর পানি তার কিনারা দূর—দূর—বহুত দূর—হো-ই আকাশের কিনারাতীক বলমল করত বাবুজী, যখন লোকের মনে হত ইঙ্গদেওকে হাতী গুড় দিয়ে চাঁদের কলসী ধরে ধরতি মারীকে ছুখে আশ্বাসন করছে, তখন জীওনলাল দেখত শুধু গ্রন্থ নয়, ছপের সঙ্গে খুব অল্প সবুজ কিছুর আমেজ যেন মিশে রয়েছে। তার ক্ষেতির ফসলের সবুজ রঙ দুনিয়ার সব কিছুর মধ্যে দেখতে পেত যেন। দেখত আর ছ-হাতে মাটি উলত। আঃ—সে যে কি মোলাম—কি মিঠা—কি ঠাণ্ডা সে তুমি বুঝবে না বাবুজী। কতদিন ওই ক্ষেতির সেই মিঠে মাটির উপর ঘুমিয়ে পড়েছে জীওনলাল। এ একটা নেশা! ওই ক্ষেতি তার ছিল স্বরণ বাবুজী! যেমনই হোক না কেন দুঃখ—ওখানে গেলেই সে দুঃখ জুড়িয়ে দেয়।

বাবুজী, রতনলাল বেদিন হঠাৎ মারা গেল সে দিন জীওনলাল ছনিয়ার একা। মাদানাই, ভাই নাই, বহিন নাই—কে তাকে সাহায্য দেবে? জীওনলালকে বেদিন সাহায্য দিয়েছিল তার ওই ক্ষেত্রির মাটি। বাপের কাজকর্ম সেরে শ্রমীান থেকে ফিরে সে বাড়ীতে থাকতেই পারলে না, লক্ষ্যার পর এসে ওই ক্ষেত্রিব ঘরো বসে রইল। জুড়িয়ে গেল তার মন। ভুলে গেল সে বাপের কথা। জীওনলালকে মন্দ যদি বলতে চাও এ জন্ত বল, কিন্তু একপাটা সত্যি বাবুজী! তার চোখের সামনে ক্ষেত্রে গঁহর চারা বের হ'ল, বড় হল, বাতাসে ছলতে লাগল, কোরা এল—আবও কত পাখী এসে ক্ষেত্রেব ফসল খেতে, সে তাদের তাড়ালে, তারপর ফসল তার চোখের সামনে পেকে উঠল, অকলু, তার যেটা আব জীওনলাল সে ফসল কাটলে, লছমনিয়া মুখ টিপে হেসে বললে—গঁহ নেহি এতো মেওয়ারা হ্যায়!

সে দিনেব কথা আজও জীওনলালের দিবি মনে আছে বাবুজী! সে দিনও মাঝরাত্রে অকলু আর লছমনিয়া এরাই এসে ক্ষেত্রে থেকে ঘরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আরে বাপরে! আজ তোমার বাপ মাঝা গেল, তার আত্মা এখনও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে জানে এই ক্ষেত্রির চারিপাশে ঘুরছে না?

অকলু শুধু হু হু পুনে গেল।—হু! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিল। বাজ্রে সে খুম থেকে উঠল—চোখ বন্ধ করেই হাটে।

একটু থেমে একটা মিড়ি খেয়ে মেওয়ারালাল বললে—বাবুজী, তুমি তো শুনেছি লিপাপাতি করেছ অনেক। এই গলির লোকখের কাছে আমি শুনেছি। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বলতো এহি ছনিয়ামে কোন্ জিনিষকে জানা সব চুয়ে শক্ত?

মাটি

প্রমত্তা বুঝতে না পেরে চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মেওয়ালাল আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বললে—মামুষকে বাবুজী। গাছপালা জানোয়ার ওদের সঙ্গে সামান্য দিন কারবার কর—ঠিক জেনে যাবে ওদের। ওদেব মেজাজ চালচলন সব ধরাবীধা। মামুষ—আবে বাপরে বাপ! নিজেকেই নিজে জানতে পায়ে না—তা' পরকে জানবে কি করে? এই জানা হয় কি ক'রে জান? জানা হয় হৃৎস্পন্দ সময়। তোমার যখন খুব ক্রোধ হবে বাবুজী—যখন তোমার মনে হবে বুকের ডিগরটা থেকে কলিজা ছিঁড়ে গেল—তখন ঠিক তুমি জানার মামুষকে চিনতে পারবে। নিজের মনের খবরও জানতে পারবে সেই দিন। তোমার যে এই শরীর বাবুজী—এই যে তোমার জন্ম—এ তো একটা ক্ষেতি। তোমার মন বসে বসে এতে বীজ ছুঁড়েছে। কিন্তু বীজ মাটিতে পড়লেই তো গাছ হয় না—ফাটে না। বীজ ফাটে কখন জান? যখন আকাশে ঘনঘটা আঁধার করে মেঘ আসে, ছনিয়ার চোখ ঝলসে দিয়ে যখন বিজলী চমকায়, কড়কড় আওয়াজে যখন তিন লোক কাঁপিয়ে দেওয়ার বজ্রের হৈকে ওঠে, বাপট খেয়ে বড় উঠে যখন সব ওলোট-পালট করে দিলে বায়, ধরতি তখন থবথর করে কাঁপে—কিন্তু তখনই তার সারা বুকময় মনের আনন্দে ফাটে লাখো লাখো বীজ। যে সব বীজ বাবুজী মাহিনার পর মাহিনা মাটির অন্দরে শুকায়ে ঝলসেছে—কোন পাত্তা কেউ জানত না—ওই যে ঘনঘটা, ওই তার লগন, ওহি লগনমে তারা নিজেকে ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়ে নিজের পাত্তা জানিয়ে দেয়। তারপর যে বীজের যেমন তেজ যেমন তার গোড়ায় মাটির সঙ্গে মিল—মিতালী—সে তেমনি বাড়বে।

বাবুজী—অকলু হুগহরের বিটীয়াহ বল আর জীনওনলাল কি

বেওয়ারীলালই বল—জুজনের কেউ না জানত নিজেকে, না জানত কেউ কাউকে। হঠাৎ একদিন তুফান এসে জীওনলালের নদীবে। আর সেই তুফানকে আপনার খেলায় মুসহবের বিচারী আপনার মাথায় টেনে নিলে।

রতনলালের মৃত্যুর মাস চারেক পর ; সেটা অগহন মহিনা বাবুজী, আমার ক্ষেতে তখন গম সব আলু মটর ছোলাব বীজ একদফা ক্ষেতে মাটির উপর বেবিরে পড়েছে আশপাশের দিয়ারা জমিন তখনও সব সাদা, শুষ্ক চষা হবেছে মাত্র—আমার জমিনে সবুজ রঙ ফুটেছে। সারা দিন ক্ষেতে পাটকাশ ক'বে আমি বাড়ী ফিরে চুলাতে আগুন দিয়েছি, দিনে খেয়েছি সস্তা, রাতে দুটি ভাত পাকাব, খারিতে চাওর ভিজিয়ে দিয়েছি, কিছু আনাজ নিয়ে কুটেতে বসেছি, খাওয়া দাওয়া সকাল সকাল পেরে যেতে হবে জিমিদারের কছারী। সেখানে বাবুজী মন্ত হাদ্ধামা।

তুমি তো বাবুজী পণ্ডিত আদমী, দেশকে কানুন তো তোমার লব জানাই আছে বাপজী আমার কোত্ হইছে—এখন জিমিদারের দপ্তরখানার বাপজীর নামের বদলে আমার নাম কায়েম করতে হবে ; সেলামী লাগবে—কেন না, জমিনে মালেক তো জিমিদার ; জিমিদার আমাকে রায়ত মেনে নেবে—সেশাদার বাড়না নিয়ে আমাকে দাখিলা দেবে তবে জমিন হবে আমার। তবে জিমিদারেরা বাপের বদলে ছেলেকে রায়াত মানতে না বলে না। ভগোয়ানকে ধিরাব বাপের স্বতাব পায় ছেলে, চেহারা পায় ছেলে, বাপের রোগ পায় ছেলে, বাপের দেনা শোধ কবে ছেলে, তখন বাপের ক্ষেত-খামার এই বা ছেলে পাবে না কেন ? জিমিদারেরা এটা মানে। তবে তারা যদি ইচ্ছে করে বাবুজী



তবে না মানতেও পারে। আদালত থেকে ‘লুটিন’ জারী করে ‘হুকুম’ দিয়ে তোমাকে উচ্ছেদ করতে পারে। ‘ওহি লিয়ে’ জিমিদারের কছারীতে যায, তহশীলদার এসেছেন। কিছু বিট তৈরী করে রেখেছি। তহশীলদারের নজরানা ভি ঠিক করে রেখেছি।’ আজ রাত্রই কাজটা শেষে নেব। এর আগে কয়েকবারই গিয়েছি। জিমিদারের বাড়ী বিহারপরিক—তা জিমিদার বলেছেন—হবে। তহশীলদারের সঙ্গেও দেখা সেখানে হয়েছিল—তিনি বলেছেন—হবে।

কুটনো কোটা শেষ করে থালায় ভিজানো চাল ধুয়ে শেষ করেছি এমন সময় বাবুজী আমার নলীবে তুফানের প্রথম ঝাপটা যেন আচমকা মারলে খাক। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল লছমনিয়া। আমি চমকে উঠলাম। অকলুর কদিন বেমারী হয়েছে। বুড়ো মানুষ অল্পেই ঝায়েল হয়ে বিছানার স্তরে আছে—কদিন। তবে কি—? আমি বললাম—লছমনিয়া!

লছমনিয়া বললে—ঝটসে এসো আমি আগ্নান করে খানা পাকাচ্ছি, মুলহরের বেটা সে কথা খেয়ালেই আনলে না, আমার হাত ধরে টানলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অকলু—

—নেহি—নেহি। ক্ষেতিমে—। ক্ষেতে—আনাদের ক্ষেতে হু’জুন কালা সাহেবলোক...সঙ্গে আদালী। সে হাঁপাতে লাগল—ছোট চোখছোটো ঝকমক করতে লাগল। দম নিয়ে বললে—ক্ষেতের কসল মাড়িয়ে তেঁকাটার উপর বস্তুর চাপিয়ে দেখছে আর জবীপের শিকলি টানছে—ইধরলে উধর। হারামজাদা, কুতাবু বাচ্চা আবার—।

দাঁতে দাঁতে সে কিস্কিস্ করে উঠল।

বাবুজী, ওই কালা সাহেবলোকের একজন লছমনিয়াকে মন্দ কথা বলেছে। সে একে মুলহরের মেয়ে, তার উপর সে লছমনিয়া—পাঞ্জাবের

রহনেওয়ালীর মত . ভেজ—সে উত্তরে গাল দিয়েছে। সাহেবটা হাত চেপে ধরতে গিয়েছিল, এক কাকিতে হাত ছাড়িয়ে সে ছুটে পালিয়ে এসেছে।

খবর শুনে আমার নখ থেকে মাথা পর্যন্ত রক্ত বেন বর্ষার দরিদ্রার পানির মত ছুটতে আরম্ভ করলে। আমি লাক দিয়ে পড়লাম। লছমনিয়া বললে—দাঁড়াও।

সে মাচান থেকে দুগাছা লাঠি পেড়ে নিয়ে বললে—অব চলো।

জমিনের কাছে এসে বাবুজী আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। শুধু সাহেবরা নয়—জমিদারের তহশীলদারও বরকন্দাজ নিয়ে সরজমিনে হাজির হয়ে গেছে। ধমক দিয়ে এক হাঁক মারলে তহশীলদার—খবরদার! তারপর বললে—আর এক পাও যদি এগুবি চাষার বেটা, তবে তোকে গুলি করে মেরে এই জমিনের মধ্যে পুতে দেব।

মেওয়ালাল এক লহমার পাথর বনে গেল। লছমনিয়া বলতে গেল—হজুর—আমাদের ক্ষেতের ফসল—

তহশীলদার বললে—নেহি। এ জমি এখন জমিদার সরকারের খাস জমি হয়েছে। সরকার থেকে হুকুম হয়েছে এ জমি জাহাজ কোম্পানীকে বন্দোবস্ত করা যাবেগা। কোম্পানীকে হিঁরা টিশন বনেগা।

বরকন্দাজেরা ততক্ষণে ক্ষেতের চারিদিকে খুঁটো পুঁতে দখলের লাল নিশান উড়িয়ে দিলে। একটা খুঁটাতে একটা কাগজে লেখা নোটিশও ঝুলিয়ে দিলে।

আমার নসীবের আকাশে চারিদিক ঝলসে দিয়ে বিজলী ঝলকে উঠল—আমার তামাম ছনিয়া কাঁপিয়ে কড়কড় করে বাজ ডেকে উঠল।



আমার কি হয়েছিল, আমি তখন কি ক'রেছিলাম জানি না, লছমনিয়াই আমাকে ছ'হাতে ধরে টেনে হুলে নিয়ে বললে—চলে আও !

বাবুজী—ঠাক এই সময়েই তুকানের এই স্ক্রুতেই বোধ হয় লছমনিয়ার বুকের অন্দরে বাজ ফাটল।

বাড়ীতে কিলে আমি যত কাঁদলাম সে তত কাঁদলে। মেওলালালের চুখে সে আগেও কঁদেছে, কিন্তু এমন ক'রে তো কাঁদে নি ! 'শাউন ভাদো' মাসের মেঘ যেমন 'বরখার' বাবুজী, বাতাস না, বিজলী না, আওয়ার না, শুধু কিম্ব কিম্ব কিম্ব কিম্ব—তেমনি ভাবে, শুধু দগদগ করে জলই ঝরে পড়ল তার চোখ থেকে, সারা রাত।

• • •

গঙ্গাজীর বুকের উপর দিয়ে কলের জাহাজ—চালায় যে সব কোম্পানী তাদেরই এক কোম্পানীর জাহাজ চলত আমাদের গাওয়ের সামনে দিয়ে। আমাদের গাওয়ের দেড় কোশ উপরে ছিল জাহাজ কোম্পানীর টিশন ঘাট। ওই টিশন ঘাট আজ কয়েক বছর—বোধ হয় পাঁচ-সাত বছর ধরে ভাঙতে শুরু করেছে। কোম্পানী বাশ কাঠ ইট পাথর বহত টেলে রুথতে চেপ্টা করেছে গঙ্গাজীর জলের তোড়ের মুখ। কিন্তু হাওয়ার মুখে খড়ের কুটোর মত সে সব ভেসে গিয়েছে। বর্ষার সময়—পনের রোজ বিশ রোজ বাদ এক একদিন চাঙড় ধরমে পড়েছে। এমনভাবে প্রতি বছরই থানিকটা স'রে স'রে শেষ পর্য্যন্ত এবছর টিশন ঘাট সরিয়ে ফেলার মতলবই পাকা করেছে কোম্পানী। এর জন্তে এই বছরে বর্ষার সময় কোম্পানীর বড়া-ভারী মগজুলা সাহেবলোক—হর

রোজ জাহাজে করে গিয়েছে আর এসেছে। বেথে গিয়েছে, কোন জাহাগার নতুন টিশন বানালে পর নিশ্চিত হতে পারবে। এ দিকে গঙ্গাজীর কিনাভের গাঁওয়ের যত জমিদার, কোম্পানীর সাহেবলোককে বহুত বহুত ভেট পাঠিয়ে, জাহাজের খানাটেবিলে খানা খাইয়ে, দামী দামী বিলাইতি মদ খাইয়ে আপন আপন সীমানার টিশন বানীতে রাজী করবার কোশিস অর্থাৎ চেষ্টা কবেছে। শেষ পর্যন্ত জিৎ হয়েছ মেওয়ারালয়ে জমিদারের। নদীও, সবই নদীও। মেওয়ারাল এই সার বুঝেছে। নইলে ঠিক যখন ষ্টেশন বশাবার উদ্বোগ হচ্ছে—তখনই মেওয়ারালয়ে বাপ মরে গিয়ে—একদম কিনারার পাঁচ বিঘা দিয়ারা—তার পাস হয়ে বাবার স্মরণ হবে কেন বল? এই অজ্ঞেই এতদিন তারা জমিনটা জীওনলালের নামে পত্তন করে নেয় নি।

হুনিরা আমার আঁধার হ'য়ে গেল বাবুজী। ছেলেও মা ম'রে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। মেওয়ারাল ওই দুঃখটা জানত, ছেলেওয়ে যখন মা তাঁ মারা গেল—তখন বরদোর পেলনা—খাওয়া—সব কেমন বিশ্বাস বেরও হয়ে গিয়েছিল। কিছু ভাগ লাগত না, শুধুই ক'রা পেত। আঠান বছরের মেওয়ারালয়ে আবার সেই হাস গিরে এল। তার জমি—সকাল থেকে সন্ধ্যা ইস্তক যে জমিতে সে বসে থেকেছে, বসে থেকেছে বসে থেকেছে; শুধু ছোটের টুকরো—পাগরের কুচি বেছে ফেলেছে, কোদাল দিয়ে একবার কেটেছে—আবার কেটেছে, বারবার কেটেছে মুঠোতে ব'রে ভুর ভুর ক'রে শু'ড়ো করেছে;—আঃ বাবুজী মেওয়ারালের সে, স্বর্গ, দুঃখ ভুলবার জাহাগা; বাপ মরে গেলে সেখানে

গিয়ে বসে থেকে সে সাধুনা পেরেছে, বাবুজী খুব যখন 'শির হুখিরেছে' মাথার বস্ত্রপায় যখন অস্থির হয়েছিল সে—তখন—

উপরের দিকে হাত তুলে মাটিওলা বললে—স্বকষ নারায়ণের নাম নিয়ে বলছি বাবু—খুট বলছি না। মাথার বস্ত্রপায় অস্থির হয়ে মেওয়ারালী ওখানে গিয়ে বসলে—বস্ত্রপায় উপশম হ'ত। গলাজীর হাওয়া তো বটেই কিন্তু তার ক্ষেতের শোভার চোখ মন তার জুড়িয়ে যেত, বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ত সে। ঘুম ভেঙে যখন উঠত—তখন বিশ্বাস কর বাবুজী—মাথার বস্ত্রপা এতটুকু আর থাকত না।

সেই জমি হারিয়ে সে কোঁদে কোঁদে সারা হয়ে গেল। সমস্ত রাত্রি তার থেকে একটু দূরে বসে বইল ওই মূলহরের সাধিনকড়া। সেও কাঁদলে অনেক। মধ্যে মধ্যে অনেক সাধুনা দিলে সে। বললে—এমনি ছাড়বে কেন জমিন? আদালত করো। বলো হাকিমকে—হজুর এটু জমিন কত কষ্ট করে তোমরা হাঁসিল করেছ। বিলকুল কথা ব'লে—বলো—অব হজুর বিচার কিজিরে—ইরে জমিন কিস্কা হার ?

বাবুজী, আমি হাসলাম, কাঁদতে কাঁদতেই হাসলাম মূলহরের বিচারের কথা শুনে। কি ক'রে জানবে সে কাহ্ননের প্যাচ! ভগোয়ান করলে ধরতির সৃষ্টি, রাজা হাঁতি ঘোড়া হাতিয়ার পন্টন নিয়ে সেই ধরতির মালিক হ'ল। সে আবার সেই মাটি দিলে জমিদারকে। এখন বাপের দাবার রোগই তোমাকে বইতে হোক—আর ঘেনাই শোধ করতে হোক—আর বাপের চেহারাই তোমার মধ্যে দেখা যাক, তার সঙ্গে মাটির মালিকানির সম্পর্ক কি? রাজার হাতিয়ারে ওখানে বাপ বেটার সম্বন্ধ খচাখচ কেটে দিয়েছে। ও কাহ্নন আলাদা! মূলহরের ঘেরে সে কাহ্নন তুই বুঝি না।

লছমনিয়া ভোরবেলা উঠে চলে গেল। সমস্তটা দিন এল না। মেঘরালাল গিরে হত্যা দ্বিগুণে পড়ে রইল তহশীলদারের কছহারীতে। কিন্তু মিথ্যে পড়ে থাক। কিরে আসতে হল অনেক গালিগালাজ খেয়ে—বেওকুক! হুকুম! মুন্সীকে বেটা চাষা! উলু কাঁহাকা! আমি কি করব? তুই এতদিন ফেলে রাখলি কেন?

সকাল লছমনিয়া কিরে এসে বললে—জোড়ো মামলা। জুড়তেই হবে। আমি গিয়েছিলাম কোশভর দূরের গ্রামের এক বুড়ো মুকতিয়ারের মুন্সী সাহেবের বাড়ী। সব বলেছি তাঁকে—তিনি বলেছেন আলবৎ জিত হবে।

তাই করলাম। না করেই বা করি কি? মনের ভিতরটা বেখাক হয়ে যাচ্ছিল। আগুন লেগে গিয়েছিল। চোখের ঘুম গিয়েছে সে আগুনে পুড়ে, পেটের খিদে গিয়েছে ছাই হয়ে তাতেই, মনে হ'ত এই আগুন লাগিয়ে দিই জমিদারের কছহারীতে, তহশীলদারের ঘরে, জমিদারের পাকা বাড়িতে, জাহাজ কোম্পানীর জাহাজে—তামাম দুনিয়ার আগুন লাগাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তা তো পারি না। কাজেই একটা কিছু ক'রে এ আগুনের দাহ থেকে বাঁচতে হবে। বাড়ীর বা ছিল রূপার গহনা বিক্রী করলাম দায়ের করলাম, মামলা।

ওদিকে কোম্পানী এসে আমার ক্ষেতের উপর স্টেশন তৈরী করবার মাগমসলা এনে ফেললে। জাহাজের পিছনে বেঁধে টেনে নিয়ে এল একটা ভাল ট্রলিন, সেটাকে আমার ক্ষেতের কাছে এনে, ক্ষেতটা কেটে ফেলতে শুরু করলে। নিয়ে এল একটা যন্ত্র। শিকল দিয়ে বেঁধে নিচে ফেলে দেয়, রাঙ্কনের মত হ'ল করে—তেমনি ধারালো লোহার দাঁত নিয়ে নদীর কিনারার পড়ে একেবারে খুঁড়ি খুঁড়ি মাটি গিলে—হাঁ

নাহি:

বন্ধ করে উঠে আসে, ফেলে দেয় পাড়ের উপর। কিনারা গভীর হতে লাগল। ওইখানে এনে লাগাবে ভাসা টেশনটাকে। উপরের জমি থেকে ফেলে দেবে একটা কাঠের তৈরী শড়কের মত লম্বা সঁকো। পাড়ের উপরে পাকা ভিত করে তার উপর টিন লাগিয়ে বানাতে শুরু করলে হুলাকে রাখানা। আর পুঁতলে মাঙ্গুলের মত লম্বা চার-চারটে শালের লকড়ি, তার মাথায় কপিকল দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে মস্ত মস্ত আলো। কিনারা থেকে আশা দবিয়া পর্যন্ত আলো ঝলমল করতে লাগল দিনেব মত, সেগুলোকে বিবে উডতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা। সিঁধা শড়কের মত বাস্তা বানিয়ে দিলে কোম্পানী, গম্বাজীও কিনারা থেকে গাঁওয়েব ভিতর হয়ে নিষে গিয়ে জুড়ে দিলে সঁকো পাকা শড়কের সঙ্গে। কাথা থেকে—কোথা থেকে আসতে লাগল হঠক হঠক চিৎকার দোকানী। বাবুজী, গাঁওকে বানিয়ে দিলে হিম-চান মাহিনার অন্দরে ছোটোলে এক গোলাগজ। গাঁওয়েব আদমীর মুখ বেড়ে গেল, স্বাদের জমি ছিল দিরাবাম তারা দাম পেলে কোম্পানীর কাছে। তাদের তো বাপ ফৌত হয় নি বাবুজী! তাবা ব্যবসা শুরু হবে দিলে। অস্ত্র অস্ত্র লোক আনাঙ্গ নিয়ে চেপে বদে বইল, বিক্রী করতে যেতে হবে না গাঁওয়ের বাইরে। যাবা গতবে খাটে তানা খাটতে লাগল কোম্পানীর কাববারে, ইমারতে। বাবুজী—মুসহরটুলিব পর্যন্ত হাল ফিরে গেল। গায়ে নীল কুর্তা চড়িয়ে মাথায় পগড়ী বেঁধে তারা হল কুলী। মুসহরদের সর্দার জগমুয় বেটাকে সাহেব ডেকে কাম দিলে, বানিয়ে দিলে মেট, জগমুকে শানালে সর্দার।

তুধু এক মেওয়ারাল—হতভাগা মেওয়ারাল ফকির বনে গেল একদিনে। বাবুজী, রাত্রি হলে ঘরে থাকতে পারত না সে, বেরিয়ে

গড়ত বাড়ী থেকে—গাঁও ছেড়ে—দূবে চলে যেত গঙ্গাজীর কিনারায়-
 কিনারায়, সেখানে ছিল জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরানোকালের পড়ো ভাঙা
 ইমারত, কোন্‌ রাজার নাকি বাড়ী ছিল, একটো ছোটালো গড় ছিল,
 সে সব ভেঙ্গে গিয়েছে—জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে, সেখানে লোকে কেউ
 যায় না, বলে পিরেতলোক ওখানে বাস করে, ওখানকার ভাঙা, ইমারত
 পাহাবা দেয়, ওখানকার একটা পাথরের টুকরো যে সবায় তার মুখে লহ
 উঠে সে মরে যায় ; পাছে পায়ে লেগে একটা পঞ্চল সরে যায় এক
 অঙ্গুলী—তাই লোকে যায় না সেখানে, বার শূণ্য একদিন গঙ্গাজীর পূজার
 দিন,—সেখানে যায়, সেখানে আছেন গঙ্গাজীব একদম কিনাবায় পঞ্চলের
 এক পাঁচালেন মত এক বেদী, সেই বেদীর গায়ে আছেন এক মহাদেওজী,
 গঙ্গাধব মহাদেও, যিনি নাকি মাণব জটায় ধরে আছেন গঙ্গামারীকে—
 সেই ভগোয়ান শিবজীকে পূজা দিতে। পূজা দিতে হয় বাবুজী—
 ফুল—বেলের পাতা—ফগমূল—দ্যার চাপাতে হয় বাবা মহাদেওজীর
 পায়ের তলায় জনা হি এক ঝুড়ি গঙ্গাজীর মাটি। সারা বরষের
 জন্মেরে—জন্মের কোন আদমীয় ওখানে যাবার একতিরার নাই।
 মেওরালালের বৃকে আগুন জলে বাবুজী, ছনিয়ার তার শাস্তি নাই,
 সে তো জানের পরোবা করে না ;—সে গাঁওয়ের ওই আলো ওই
 বাজারের হালিহুলা সইতে না পেবে চলে যেত সেখানে। মরণ হয়তো
 হোক। বিবাহ কর বাবুজী, সে বাড়ীরা আদমীর মত ওই গঙ্গাধরজীর
 আত্মানে—বৃক চাপড়ে চাপড়ে কে’দে বেড়াত—চীৎকার করে কীদন্ত।

—হে গঙ্গাধরজী—মেরে জমিন ! হে মহাদেওজী—মেরে ক্ষেত !
 হে দেওতা, মেরে জমিন !—এক এক সময় শূন্যই চীৎকার করত—হে
 ভগোয়ান ! হে ভগোয়ান ! হে ভগোয়ান !

তার কারা শূন্য গঙ্গার বুকে নৌকার মাঝিরা ভাবত পিরেত কাঁদছে।
তার কারার আওরাতে চমকে শেরালেরা ছুটে পালিয়ে বেত পাশ দিয়ে,
হুড়ার চলে বেত গৌ গৌ শব্দ করে, মধ্যে মধ্যে আঁধারের মধ্যে ঘুরে
দাঁড়িয়ে দেখত, তাদের চোখগুলো অগত অগত কন্ডে; নুনো বরাণ্ডা
চরের দাঁটি খুঁড়ে কদ খেতে খেতে চমকে উঠত, তীরের মত ছুটে চলে
বেত অগলের মধ্যে। মেওয়ালাল গ্রাহ্যই করত না সে সব। সে তখন
সত্যিই পাগল হয়ে যেত।

মেওয়ালালজী! বাবু মেওয়ালাল!

এক মূলহরের বেটা লছমনিয়া জানত তার এই ঠিকানা—তার
কলিজার অন্তরের এই হাল। মেওয়ালালের ক্ষেত-খামার চলে গেছে,
মেওয়ালালের ঘরের বা কিছু ছিল সে সবও গেছে, এখন লছমনিয়া অস্ত্র
চাকরী করে। গোটা গাঁওয়েও লোক কাম করছে জাহাজ কোম্পানীর
কারবারে, শূন্য মূলহরের বেটা ও পথে হাটে না, সে চাকরানীর কাম
নিরেছে নিনগাঁওয়ে, সেই বুড়া মুকতিয়ারের মুনী বাবুর বাড়ীতে;
সকালে উঠে চলে যায়, ফেরে রাতে। ফিরে মেওয়ালালের বাড়ী এসে
খবর দেয় মামলার। বুড়া মুকতিয়ারের মুনী মামলার তার নিয়েছে,
সে নিজেকে তর্জিব করে; ওই যে জমিদার ওর উপর মুকতিয়ারের মুনী
বুড়ার তারী আক্রোশ, মুকতিয়ারের কেনা এক জমিন জমিদার
মেওয়ালালের জমিনের মতই কেড়ে নিয়েছে কিছুদিন আগে;
মুকতিয়ারের মুনী বলে—জমিদারের জিজ আমি নিকালকে ছোড়বে।
লছমনিয়া ফেরে সেই সব আশার কথা নিয়ে। মেওয়ালালকে বাড়ীতে
পেলে বলে সেই সব কথা। না পেলে—গঙ্গার কিনারায় কিনারায়
চলে আসে একা পিরেতের মত; মূলহরের বেটীর ভয় নাই, এক

ভাঙা হাতে চলে এসে ওই গান্ধারবীর অঙ্গলে ভাঙা গড়ের
দেওয়ালের উপর ঠাঁড়িয়ে ডাকে—মেওয়ালাল! বাবু মেওয়ালাল!

মেওয়ালালের কানে ওর আওয়াজ এলে সে খানিকটা ঠাঙা হয়।
মেওয়ালালের মনে হয় ওই লছমনিয়া যদি দিন-রাত বলে থাকে তার
পাশে, তবে তার বুকের এই বাহ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু বলতে পারে
না সে কথা! লছমনিয়ার আওয়াজ শুনে সে এগিরে এসে লাড়ো দেয়—
লছমনিয়া!

—বাবু মেওয়ালাল। ছি মেওয়ালাল! তোমাকে কত বারণ
করি, তবু তুমি এসেছ এখানে? হররোজ আসছ! আমার কথা
শুনছ না তুমি? বাবুলাব—এখানে—

মেওয়ালাল হাউ হাউ করে কাঁদে! লছমনিয়া তার হাত ধরে টেনে
পাথরের দেওয়ালের উপর বসায়; নিজের আঁচলখানা মেওয়ালালের
হাতে দিয়ে বলে—নাও চোখ বোছ। তারপর বলতে শুরু করে
সুকতিয়ারের সুন্দীবাবুর কথা। মেওয়ালালকে উঠিয়ে বাড়ী কেনার
কথা ভুলে যায়। বলে—সুকতিয়ার বলে, বেধে গেলে জিমিয়ারকে।
পিচাশ, ষড়্‌গাল! এত বড় হাঁ। বেলে ছনিয়ার সারতের মথালবাবু পেটে
পুরেও কিদে মেটে না। এবার আমি একটা লোহার শিক তাকিয়ে
ওর মুখে পুরে দেব। পুড়িয়ে থাক করে দোষ ওর পেট! কিদে ওর
খন্ডন করে দোষ।

আইনকাহ্ননের কথা শুনহরের বেটা বুঝতে পারে না, সে-সব বলতে
পারে না লছমনিয়া। বলে—তোমাকে একবকে যেতে বলছে
বাবুজী

মেওয়ালাল মুক্খ হলো সুন্দীর বেটা, সে কাহ্নন বুঝতে পারে কিছু

মাটি

কিছু। দিয়ারা জমির অবস্থা—রায়তি জমির চেয়েও খারাপ। ওর বন্দোবস্তি রায়তি জমির মত—ঐটুকু শক্তও নয়। তার আশা ছিল না। তবে মুকতিয়ারের মুলী বলে দেশের হাল নাকি অনেক বদল হয়েছে। হোক না দিয়ারা জমিন। তিনপুরুষ তোরা এই জমিন ভোগ করছিল, এইটাই হ'ল বড় কথা।

এমন এমন কথা বলে মুকতিয়ারের মুলীবাবু যে, মেওয়ালালের ঠাণ্ডা বক্ত চনচন করে ওঠে। তার আশা হয়। নতুন কিছু বেচে আবার টাকা সংগ্রহ করে মুকতিয়ারের মুলীর হাতে এনে দেয়।

সেদিন লছমনিয়া মেওয়ালালের হাতে ঝাকি দিয়ে বললে—মামলা করতে হো গেয়া বাবুজী—মেরে মেওয়ালানজী—!

—ফতে হো গেয়া! চীৎকার করে উঠল মেওয়ালাল! ও—হো! হো—হো! হায়! হায়! গঙ্গাজীব বুকের উপর ঘাচ্ছিল একটা কেঁরার। নৌকা, ড্রার উপরে কারা কে'দে উঠল! বোধ হয় যাত্রীরা ভয় পেয়েছিল! ভাঙা গড়ের পিরেতের কথা কদিন থেকে চারিদিকে খুব জোর ছড়িয়ে পড়েছে।

ওদের ভয়ের কান্না শুনে খিল-খিল করে হেসে উঠল মুলহরের বেটা। পাঞ্জাবের রহনেওলীর মত চেহারা লছমনিয়ার গলার আওয়াজ তুমি শোন নি বাবুজী,—শুনলে বুঝতে পারতে! আঁখিয়ার বেন নেচে উঠল সে হাসির লক্ষে।

যে বললে—জিবিদারের তালীদদার আজ নিজে এসেছিল মুলীজীর বাড়ী। মামলা যদি আমাদের কতে না হবে মেওয়ালানজী, তবে তালীদদার এতটা পথ ভেঙ্গে মুলীর বাড়ী আসবে কেন? সে নাচতে শুরু

করে দিলে। সেই আধিরার রাত, কালো লছমনিয়া, হুস্বরেরা তাকে বলে সাপিনকড়া, বাবুজী, আমাব আঁথের উপর আজও ভাঁসছে সে নাচন—সে আধিরার—; বাবুজী, আঁথিও নাচতে লাগলাম। চাঁৎকার করলাম কত ! লছমনিয়া খিল-খিল করে হাসলে।

হঠাৎ কিনারা আলোর ভেসে গেল ! আহাজ আসছিল !, আমরা দুজনে একেবারে অঙ্গলেভরা পাথরের যে মহাদেওজীর আন্তান তার পিছনে গিয়ে ঢুকলাম। ওখানে ঢুকতে মানা আছে বাবুজী। মহাদেওজীর ‘ভূত-পিচাশেরী’ সেখানটা পাহারা দেয়। কিন্তু বাবুজী মহাদেওজীর মন্দিরের চুড়ার উপরেও রাজ ফেটে গাছ গজায়, বীজ যে তখন ফেটেছে ওদের বৃকের মধ্যে এবং তাহার কেন সে মানা ! এইখানে সেই ভূত-পিরেতে ভরা বন অঙ্গলের মধ্যে সে মেওয়ালালের হাত চেপে ধরে হঠাৎ খুব চাপাগলায় বললে—মেওয়ালাজী !

গাছের কঁকে কঁকে আলোর ছোট একটা টুকরো ছটা তার মুখের উপর পড়েছিল। সে মুখের চেহারা দেখে মেওয়ালানের দিশা হারিয়ে গেল, সে কা করলে বাবুজী—তা-তার করা উচিত হয়নি, সে বাবুজী—পাগল হয়ে গেল বোধ হয়, সে লছমনিয়াকে টেনে বৃকে জড়িয়ে ধরলে। মুখে শুধু একটি কথা সে বলতে পারলে—পিরারী !

অঙ্কুত বাবুজী মেরেজাত ! লছমনিয়া কথা বললে না—বর্তা বললে না, কঁদতে লাগল। কুঁপিয়ে কুঁপিরে কঁদতে লাগল।

সারাটা রাত কেটে গেল। সকাল হয়ে গেল। সূর্য্য নারায়ণের ছটা ঝলক দিয়ে উঠল লামনে পূরব দিকে। চোখে আলো লেগে জেগে মেওয়ালাল দেখলে, লছমনিয়া নাই ! সে ভয় পেলে। ভূত পেরেত্তের এই আন্তানার কি হল তার ? ‘দানা কি দইত’ ভুলে নিরে গেল নাকি ?

মাটি

—মেওয়ালাল! কোথা থেকে ডাকলে লছমনিয়া।

—লছমনিয়া!

দেখো তাজ্জব—চলে আও! মাটির ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে
লছমনিয়ার।

—কার্হা—কোথার তুই?

—সামনে দেখ একটা সুড়ঙ্গ, নেমে এস—

—সুড়ঙ্গ?

সত্যই সুড়ঙ্গ, একখানা পাথর আখখানা হয়ে ভেঙে গিয়েছে; একটা
একাত্তর বটগাছের মোটা বুরি—পাথর কাটিয়ে নেমে গিয়েছে নীচে;
অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লছমনিয়া। সুড়ঙ্গটা অন্ধকার নয়—স্পষ্ট
দেখা যাচ্ছে লছমনিয়াকে! সে বললে—নেমে এস বটের বুরি
ধবে।

তাজ্জবই বটে বাবুজী! একটা কাপা সুড়ঙ্গ, জলে কাদার খিক-
খিক করছে; সামনে এক পাথরের মেওয়াল, তা থেকে একটা পাথর
আখখানা খসে বুলছে, সেই ফাঁক দিয়ে আলো এসে লছমনিয়ার উপর
পড়েছে। লছমনিয়া দেখলে আত্মল দিগন্ত—দেখো!

দেখলাম, সূর্য্য নারায়ণের আলোর ছটা বাজিয়ে ঝকঝক করে
বলে চলেছে দরিয়ার পানি!

মুসহরের যেটর চোখও ঝকঝক করছে—সে বললে, ভাল করে
খুঁজতে হবে, এখানে নিশ্চয় অনেক টাকা আছে।

মেওয়ালাল শিউরে উঠে বললে—টাকায় কাজ নাই লছমনিয়া, টাকা
ধাকলেই সেখানে হয় থাকবে অজগর, নয় থাকবে বক।

সে বললে—যেই থাক—আগে থাকব আমি। আমি তাকে পাকড়াব

—কুমি'মারবে মাথার ডাঙা! তার আগে দেওয়ালের ওই আঁখতাত্তা পঞ্চলটাকে ভেঙে, কেলে দিতে হবে। আলো চাই।

সেই দিন রাত্রেই সে এল দুই গাঁইতিরা কাঁধে নিয়ে। মেওয়ালালের হাতে একটা দিই খুললে—পাকড়ো।

কিন্তু রাত্রেই আখিরের কাম হয় না। সুড়ঙ্গের অন্ধকারে আলো ধপু করে নিভে যায়। সুকতিয়ারের সুন্দীর বাড়ীর কাম সে ছেড়ে দিলে। ভোরবেলা থেকে পঞ্চলে গাঁইতিরা চলতে শুরু হল। বাপরে—সে কি শব্দ! স্নেন কামান দাগার শব্দ! কিন্তু আশ্চর্য্য, সুড়ঙ্গের বাইরে কিছু শোনা যায় না। দশ দিনে গলে পড়ল এক পঞ্চল, আর একটাব আঁখতানা সর্ব্বল। সেই আলোতে লছমনিয়া খুঁজতে শুরু করলে—কোথার টাকা! কিন্তু কোথায় টাকা? শুধু হিম হয়ে যেতে লাগল সর্ব্বাঙ্গ! ওদিকে ভিতরের অল দিন দিন বাড়ছে! বর্ষা শুরু হয়েছে। সর্ব্বাঙ্গে কাঁদা মেখে উঠে এসে শেষে একদিন লছমনিয়া বললে—নসীব মেওয়ালালজী! মিলল না! চলো ঘর!

গঙ্গার 'নেমে আন্ধান করে হু'জনে হু'পথে ফিরলাম। গঙ্গার সেদিন বান ডেকেছে—পাথরের দেওয়ালের ভিত্তে এসে ঠেকেছে লাগ জল, কেনা—খড়-কুটো।

বাড়ী এসে সব পৌঁচেছি বাবুজী—দেখি আদালতকে পিরাধা এক লুটিশ হাতে দাঁড়িয়ে। —কি? কিসের লুটিশ? বুকটা ধড়াস করে উঠল বাবুজী!

পিরাধা বললে—রতনলালের বেটা জীওনলালের এই বাড়ী কোরক হল।

—কোরক? কেন?

—মামলা করেছিল। জামিনদারে সঙ্গে। মামলার হেরে গেছে। তারই খরচার দায়ে কোরক করছে—মামলার আগে কোরক, কে'ও কি—ওর তো আর কিছু নাই, বিক্রী করে পালিয়ে পাছে ফাঁকি দেয়—তাই আদালত এই হুকুম দিয়েছে।

—মামলার হেরে গিয়েছে জীওনলাল ?

হেসে পিয়াদা বললে—উজবুকেরা এমনি করেই হারে। সে তো দশরোজ আগে রায় হয়ে গিয়েছে। মুকতিয়াবের বুঢ়া মুন্সীর সঙ্গে জিমিদারের আপোষ হ'ল—ওর কোন্ জমিন জিমিদার নিয়েছিল—ফিরে দিলে—বাস—মুন্সীবুঢ়া একদম গায়েব করলে নিজেকে, উকীল পেলে না টাকা, মামলা হল জিমিদারের মায় খরচা ডিকরি।

খুব একচোট হাসলে পিয়াদা—হা—হা—করে—

জীওনলালও হাসলে—হা—হা—হা—হা করে ওরই সঙ্গে।

বাস্—একদম মগজ বিগড়ে গেল! জঙ্গলে বসে দিনরাত হাসতে লাগল। হা—হা—হা—হা! লছমনিয়া মুসহরকে বেটা ডাকলেও লাড়া দেয় না।

লছমনিয়া সেদিন ওর হাত ধরে টানতে সুরু করলে—বললে, হেসো না! এস। চোখ তার ঝকঝক করছে। মুখখানা হয়ে উঠেছে কি এক রকম!

কীকি খেয়ে মেওয়ালালের খানিকটা সন্নিহিত কিরল—বললে—কি ?

—দেখো। আও হামরা সাথ!

বাবুজী, ওই যে সড়কের মুখ—ওই মুখের কাছে এনে—দেখালে, ভিতরটার জলে থৈ থৈ করছে। শব্দ উঠছে হড়—হড় হড়—হড়!

ওই পাঁচীলের পাথর সরেছে—তারই ভিতর দিয়ে ঢুকছে দরিয়ার তুফান।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশে মেঘ করছে খমখম, ছাইরের মত রঙ। ঝিকঝিক করে বিজলী চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে বাবুজী শুম-শুম করে—বেন পুলের উপর দিয়ে চলেছে ডাকগাড়ী তুফান মেল। দরিয়৷ তখন চলকে চলকে উঠছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। মেঘের বিজলীর ইসারায় বেন চমকে চমকে উঠছে। মধ্যে মধ্যে উথলে ফেঁপে উঠছে—চলকে পড়ছে বেন। এক এক সময় শব্দ উঠছে—প্রচণ্ড শব্দ! মাটি ধসছে। পাড় ভাঙছে দরিয়৷।

সারাতা রাত হুঁজনে বসে রইলাম সেই গতের ভিতর মুখ রেখে। দেখতে কিছু পাই না—শুধু শব্দ শুনি হড়—হড়—হড়—হড়!

ভোর রাত তখন বাবুজী। ঘুমিয়ে পড়েছিল হুঁজনে ওই বর্ষার মধ্যেই ষটগাছটার তলায়। হুঁজনে হুঁজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ যে একটা প্রলয়ের মত আওয়াজ—মনে হল আকাশের মেঘ ভেঙে বোধহয় নেমে আসছে! চমকে উঠে বসল হুঁজনে! মেঘ নয় বাবুজী—ওই গঙ্গাধর মহাদেওজীর পাথরের বেদী—ওর পাঁচিলটা। লঙ্ঘনিয়া আমাকে জোরে ঝাঁকি দিয়ে টানলে—বললে, জলদি জলদি—ওঠ—গাছের ওপর উঠে পড়।

গাছের উপর উঠে দেখলাম, তুফানের অগ্নি ভরে গেল ওই পুরানো গড়টা গোটা দরিয়ার ঝাঁকু মুখ বেন ঘুরে সোজা হয়ে গেল, জল ছুটল তীরের মত। আরে বাপরে—সে কি জল—সে কত জল—বাহুকি নাগ ঘেন লাখো ফণা তুলে ছোঁবল মারতে মারতে এগিরে চলল—গাঁওয়ের মুখে। ভেলে যাবে গাঁও।—হে ভগোয়ান।

নাট্য

—নেহি। চীৎকার করে উঠল লছমনিয়া।—এ ধারে বেঁধো।
হেসে উঠল সে।

দেখি ওই পাঁচিল ভেঙে গজাঙ্গীর মুখ ঘুরে গিয়ে জাহাজের টিনঘাট
পড়ে গেছে বাক দরিয়ান, আলোর খুঁটিগুলো ঊপড়ে পঁড়ছে, হুলাকের-
খানার টিনের চালাটা ভেসে যাচ্ছে, ওই যে লোহার অবরুদ্ধ ভাঙ্গা
টিন—তার মোটা শিকল ছিঁড়ে পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ভেসে চলেছে
—কে'থার চলেছে কে জানে!

আমিও এবার হা—হা করে হেসে উঠলাম। আমরা দু'জনে নাচতে
লাগলাম ওই বটগাছের ডালে—ভূত আর প্রেতিনীর মত।—

তিন দিন পর পুলিশের নৌকা এলে আমাদের গরিপতাব করলে।
আমাদের কাণ্ড জানাজানি হয়ে গেছে বায়ুজী! জাহাজ কোম্পানীর
কলের নৌকা তদন্ত করতে এসে দেখেছে আমাদের, দেখে গেছে ভাঙা
পাঁচিল। তার আগেও নাকি আমাদের দেখেছে জাহাজী আলোয়।
গজাঙ্গীর আত্মানের মুখে মন্ত বাক, ওই যে পাথরের পাঁচিল, ওতেই
পানি ধাক্কা খেয়ে ঘুরে চলত, পাঁচিলের নীচে একটা চড়া পড়েছিল—
পাতলা চড়া, বর্ষা ছাড়া জল ওখানে থাকত না, কিন্তু বর্ষার সময় জল
চড়া থেকে পাঁচিলের গায়ে এসে ঠেকত; তখন কোম্পানী চড়ার সীমানা
বরাবর পুঁতে দিত খুঁটির নিশানা—সেই নিশানাকে পাশে রেখে
জাহাজকে চলতে হ'ত হুঁসিয়ারির সঙ্গে—না হলে জাহাজের তলা ঠেকে
বেধে যাবে ওই চড়ায়। রাত্রে জোর আলো গোমানে কেলে সারং নিজে
দাঁড়িয়ে দেখত জাহাজ ঠিক নিশানাকে পাশে রেখে চলেছে কিনা।
বাকের মুখে আলোটা এসে বরাবর এসে পড়ত ওই ভাঙা গুড়ের জললে,
সেই আলোর সারং আমাদের কব্বেকদিনই দেখেছিল, খালসী লোকও

বেধেছিল, তারা ভয়ও পেয়েছিল—গিরেষ্ঠ কি দান্য-বৈভবের খেলা। সারথী ছরবীন কবে আমাদের চিনে, হেসেছিল। ভেবেছিল—। বা তাবে বাবুজী মাহুদ—তাই ভেবেছিল। ভাবতে পারেনি—এক জোরাম আর এক জোরানী—দু'জনে এই নিরালা ঠাইয়ে এসে গাঁইতিয়া চালিয়ে মহাদেওজীর বেদীর পাথর খসানো। তা ছাড়া ওই মহাদেওজীর পাথরের বেদী ভই পুরানো পাঁচালের যে এত দাম তাও বুঝতে পারেনি। কোন দিন কেউ ভাবতে পারেনি যে, পাথরের পাঁচালের পিছনে আছে এমন হুড়ক। হুড়কটা নাকি এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত সিধা টানা ছিল আগে। এত সব যদি কোম্পানী জানত বাবুজী তবে ওরা হ'লিয়ার হয়ে যেত। তা হলে বন্দুক নিয়ে সাত্তী বসিয়ে রাখত বাবুজী। নিজে থেকে ওরা ওই পাঁচালকে 'মেরান্নত' করত। বড়ো বড়ো লাগলুখ সাহেবলোক এসে সব দেখলে। ওহি যে কালাসাহেব—যে নাকি এসেছিল জরীপ করতে, টিশনের জারগা দেখতে বাবুজী—ওর নৌকরী ওহি কসুর লিয়ে এক কলমমে খতম হয়ে গেল।

আমাদের দু'জনের মেরান্ন হয়ে গেল। বড়ো আদালতে জুরী নিয়ে বিচার হ'ল বাবুজী। ভামাম দেশ ভেসে গিয়েছে। টিশনের পাক্সা পর্বত নাই। বাবুজী, আমার দিয়ারা জমির বিলকুল মাটি গঙ্গাজী খেরে নিয়ে পেটে পুরেছে। সেখানে বিছিয়ে দিয়েছে মিহি 'বালুকে' পথ। তার উপর দিয়ে চলছে এখন গঙ্গাজী।

আমার সাজা হ'ল পাঁচ বছর। লছমনিয়ার হ'ল দু বছর। সরকারী উকীলসাব সওয়ালে বললে—যে কাম করেছে তাতে ওদের কীসীতে লটকে দেওয়া উচিত। কে'ও-কি, ভামাম এক এলাকা বরবাদ করে দিয়েছে—দরিয়ার তুফান।

আমি মনে মনে বলেছিলাম সেদিন—দাও লটকে। কুছ আকর্ষণে
নহি। জান বাবুজী—জিমিয়ারের কছারী গিয়েছে তুফানে, টিশন
গিয়েছে, আওর বাবুজী—ওই যে মুকতিয়ারের মুন্সী—যে বেইমানী
করেছিল তারও বাড়ীঘর—তামাম পড়ে গিয়েছে। আমার আর
সানীতে লটকাতে আকশোষ কি তখন?

আমার উকীল,—সরকার থেকে দিয়েছিল উকীল—আমি দিই নি,
সে বললে—কসুর খুব বড় তাতে আর ভুল কি? কিন্তু ওবা ও মতলবে
পাথর সরায় নি। ওরা কি করে জানবে—এমন হবে? বড় বড়
সাহেবলোকের মগজে বা আসে নি—সে ওদের মগজে আসবে কি
ক'রে? ওরা গুড়গুড় দেখে—সেখানে খুঁজতে গিয়েছিল টাকা!

অজ্ঞ বাহাদুর জুরী লোক মানলে সে কথা। আর মেনে নিলে—
লছমনিয়ার কসুর এতে কম। ভাবলে তারা—আমিই তাকে ভুলিয়ে
এঁ কামে গুঞ্জে নিয়েছি। ওকে দিলে ছ বছর। আমি খুব খুশী হলাম।
ভগোয়ানকে বললাম—এদের তুমি মঙ্গল করো। পরণাম করলাম—
লজামাইকে। পরণাম—তোমাকে লাখো পরণাম মাইজী! আমার
উপর অবিচারের তুমি সাজা দিয়েছ। হাসতে হাসতে চলে গেলাম
লটকে। মগজ আমার লাক হয়ে গেল বাবুজী। পাচ বরিষ কোথা
দিয়ে কেটে গেল জানতে পারলাম না!

কি করে জানতে পারব বল? তখন যে আমি পেরেছি। মিল
গিয়া হামারা—কি বলছ বাবুজী? কি পেরেছি? লছমনিয়াকে—
পেরেছি আমি। থাক না কেন সে আলাদা জেলে, তবু তাকে পেরেছি।
এ এক মজার পাওরা বাবুজী। কি করে পায় তা জানি না, তবে পার!
দিন রাত ও আমার আঁখের সামনে থাকত। রাত্রে বাবুজী—

আধিরায়ের মধ্যে ওর সঙ্গে সত্যি সত্যি কথা কইতাম আমি। অল্প অল্প করেবীলোক—আমাকে বলত, পাগল—বাউরা। আমি হাসতাম। হাসতে হাসতে একরোজ বেরিয়ে এলাম জেল থেকে।

*

*

*

ঠাঁং মাটিওলার চেহারা পালটে গেল। ভুল বললাম। চেহারা ওব আগেই পালটে গিয়েছিল। গর বগতে বগতেই পালটে গিয়েছিল। ওর বীকা ঘাড়টা যেন সোজা হয়ে উঠেছিল, ধনুকের মত মেরুদণ্ডটা এক অস্বাভাবিক শক্তির টানে যেন ছিড়ে—সোজা হয়ে কাঁধের কুঁজটাকে প্রায় অর্ধেকেরও বেশী মিলিয়ে দি়েছিল পিঠের সঙ্গে; ঠেলে বেরিয়ে আসা বুক—স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে চওড়া দেখাচ্ছিল যেন; —একজন শক্তিশালী প্রচণ্ড মানুষ—যেন ওর ওই ভাঙাচোরা বিকৃত দেহ কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে কথা বলছিল এতক্ষণ। চোখ দুটোর দৃষ্টির মধ্যে যে শান্ত শিষ্ট মানুষটি—অহরহ ভেসে থাকে জলের মধ্যে সমাপিত সন্ন্যাসীর মত—তার অস্তিত্বই ছিল না। গর বগতে বগতে সে ভূই হাতে আমাব তক্তাপোখের সতরঞ্চি চাদর খামচাচ্ছিল অবিরাম।

সেই চেহারা আবার পালটে গিরে—কিরে এল পূর্বের চেহারা। সেই ভাঙা মানুষ। জীওনলাল যেন আমার চোখের সামনেই হয়ে গেল মাটিওলা মেওয়ারাল। মাটিব বস্তা মাথায় বরে—মাটির ভিতরের—কাচা পাথরের কুচিতে কেটে—কুচিকে ভর্তি হয়ে গেল, ঘাড়ের বস্তা বরে বরে ক্রমশঃ ঘাড়ের পেশী বেকে, জমে—বেকে গেল, বুকটা ঠেলে বেরল, বকের পাখর বেকল, কাঁধের নীচে হাড় উঁচু হয়ে উঠে কঁজ চৈরী হ'ল।

মাটি

স্বর্ধীকাল বৎসরের পর বৎসর মাটি বয়ে ক্ষেতের মাঝিক জীওনললি হয়ে গেল মাটিওলা মেওয়ারাল। চোখের দৃষ্টিও গেল পালটে। হর তো এই মহানগরে এই দীন কাজ ক'রে ক'রে—সেখানেও লাগল মাটির প্রলেপ—ঘোলা চোখে—দীনতাত্তরা দৃষ্টি উঠল ফুটে; যাকে আমার মনে হচ্ছে—শান্ত শিষ্ট এবং স্তম্ভর।

মেওয়ারাল বললে—কাটক থেকে বেরিয়ে এলাম বাবুজী মনে ঠিক দিয়ে নিলাম কি—গাঁওয়ে কিরৈই মুসহরের বিটীয়াকে নিয়ে ছনিয়াতে তেলে পড়ব। গাঁওয়ে থাকব না, থাকতে পারব না, চলে বাব ওকে নিয়ে। জাতে ধরমে জলাঞ্জলি আগেই দিয়েছি—এবার ওর ঘরে—ওর রান্না—ওর খারিয়াতে—একসঙ্গে খেয়ে আমিও হয়ে বাব মুসহর। ছনিয়াতে ওই মুসহরের বিটীয়াই তো আমার সত্যি—আর সব তো আমার কাছে ফুট! ওকে পেলেই আমি পেয়ে বাব তামাম ছনিয়ার মালিকানি! কিছু বাবুজী—

—কি ? কি হ'ল লছমনিয়ার ? আমি প্রশ্ন করলাম।

—সেও তখন আলগ ছনিয়া পেরেছে আমারই মত। মুসহরের সর্দার —জগদু—, সে ছেলে বললে—তোহার লছমনিয়া সাহেবের বেটার মা হয়েছে। মেমসাহেব বন্ গিয়েছে। তার আগে বলে নি বাবু ছটো কথা। গাঁওয়ের কথা। দেখলাম বাবু নতুন গাঁও বসে গিয়েছে শহরের মত। সব ওই জাহাজ কোম্পানীর দৌলতে বাবু। জাহাজ কোম্পানী আবার গড়েছে নয়া টিশন। বড় ভাতী টিশন হয়েছে এবার। বুঝেছ বাবুজী—মহাধেওজীর আন্তানকে আবার গড়েছে, লোহা দিয়ে—আর কঙ্কর বিলাইতি মাটি দিয়ে, তার কোলে—লোহার জাল দিয়ে বেঁধে বিছিয়ে দিয়েছে বড় বড় পথলের চাই। টিশনের কিনারা

আগাসোড়া—পাক্য করে বাঁধিঃ বিয়েছে। এবার চারটে আলো নয়, শালের লকড়ী নয়, লোহার খুঁটি পুঁতেছে দশ-দশঠো, তাতে জলছে বড় বড় আলো। কি টেলিগিরাপ বসে গিয়েছে। বাজার বসে গিয়েছে—শহরের মত; ৩৮৫পানিকে ছকান সমেত বসে গিয়েছে কু-ভিনটে। বললাম—ভাল—ভাল, ভগোয়ান মালিক; উনকে মজি! জীওনলাল—তোমার কন্যার ভগোয়ান খুঁধরে বিয়েছেন! ভাল হয়েছে!

দেখতে দেখতেই চলে গেলাম—ওই মহাদেওজীর আশ্রানের দিকে। ওখানে ওই যে নয়া বাঁধ হয়েছে—সেখানে এক বাংলা বনে গিয়েছে—এই ভিশন—এই বাঁধ—ভদ্রারকের অন্তে সেখানে থাকে কোম্পানীর এক অপসুর; এক কালা 'সাহেব'। এইখানেই থাকে মুলহরের বিটীয়া লজ্জমনিয়া।

মুলহরের লাপিনকন্ডা—পাঞ্জাবের রহনেওয়ালীর মত লম্বা। বাংলা থেকে বেরবামাত্র আমি চিনলাম। কিন্তু কাছে যখন এল—তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম। সে কি তার সাজপোষাক! রঙীন ছিটের ঝাড়রা কাঁচুলী রং ধপধপে সাধ। কাপড়—ধপধপে সাধ। জামা, খঁসখঁসে চুলে লম্বা বেণী। সাহেবলোকের আয়া! সাহেবের মেম মরে গিয়েছে—তার ছুই ছেলেকে সে মানুষ করে।

সে বললে—তারও বেণী বেওয়ালাল! এস আমার সঙ্গে। বাগানের এক পাশে ছোট ঘর—সেখানে নিয়ে গিয়ে দেখালে বছরখানেকের এক বাচ্চা। খুঁকে জড়িয়ে ধরে বললে—আমার জীবনকে আশিরাদা রাতের টাং, বেওয়ালালবাবু!

এমন মিষ্টি হাসলে লজ্জমনিয়া যে, সে তোমাকে কি বলব! তারপর বললে—বলতে তার এতটুকু সরব হল না—বললে—সাহেব আমাকে বিয়েছে। আমার নিজের ছেলে।

তারপর বললে—তুমি সে সব ভুলে যাও জীওনলালবাবু।

আমি আর কিছু বললাম না তাকে। কি বলব? আগেই আমার দুঃখ-চোখ জলে ভরে গিয়েছিল ওব কথা শুনে। চলে এলাম। হুধ হল না এমন নয়—হ'ল তবু খুসী হয়েই চলে এলাম। ওর খুসী মুখ দেখে খুসী হয়ে চলে এলাম। ঝুট রাতে নয় বাবুজী, সূর্য্য নারায়ণ গঙ্গামাইজীর নাম নিয়ে বলছি আমি। এ কথা সাধুকে বলেছিলাম, সাধুজী খুব ঘাড় নেড়েছিলেন—সীতারামজীর অন্ন দিয়ে ন। মহাবীর কাহারের না শুনে আমাকে ভয় করেছিল, গছমনিয়াকে খারাপ কথা বলেছিল। তুমি কি বলবে আমি জানি না। লছমনিয়া খুসী হ'লে আমার—চোখের উপর ভাগছে।

খুসী হয়েই চলে এলাম। চলে এলাম বাবুজী কলকাতায়। ওখানে থাকতে মন চাইগ না। আর ওখানের লোকে আমার উপর ভরানক চট। চটেই তো বাবুজী। আমি তো অনেক কষ্ট ওদের দিয়েছি। কলকাতা এলাম, ভাবলাম—যজুর পাটব কিংবা কোন চাকরী বাকরী পেলে করব। পাটব খাব। মূলহবের বেটীকে ভাবতে ভাবতেই আমার জীবন কেটে যাবে। কিন্তু হয়ে গেল অল্প রকম। গঙ্গামাইজী তা হতে দিলেন না। প্রথম বোজাই বাবুজী, হাওড়া টিশনে নেমে কলকাতার ঢুকে—কোথা যাব ঠিক করতে না পেরে গঙ্গাজীর ঘাটে বসলাম। আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম, গাড়ী ঘোড়া লোক, এত বড় বড় বাড়ী দেখে কান্না পাক্ছিল। কেন এলাম এখানে? রাস্তার ঘাটে—কোথাও এডটুকু মাটি মাই, পাথরের—ইটের—লোহার—পিচের উপর পা ফেলে শরীর কেমন শিউরে উঠছিল বাবুজী। গঙ্গাজীর ঘাটে বলে থাকতে থাকতে ওসব ভুলে গেলাম। মনে হ'ল—এইতো সেই

গঙ্গাজী। গঙ্গাজীর এই যে এখানে ঘোলা জল, ওই জলেই আছে তো আমার দেহী ক্ষেতির মাটি। ভাবছি, এমন সময় তাটি পড়ল গঙ্গার। আমাদের বেশে তাটি নাই ছোয়ার নাই। আমি অধাক হয়ে দেখলাম। জেগে গেল দু-পাশের কাঁধ। মাটি, চিক্‌চিকে বালি যেখানে মিহি পলি। ঠিক আমার ক্ষেতির মাটি। কি মনে হ'ল—তুলে নিলাম খানিকটা মাটি, দু-হাতে ঝাঁটলাম, পিষলাম, নাকের কাছে এনে গন্ধ শুকলাম। মনে হল অবিকল সেই মাটি। দু-হাত তরে মাটি আমি তাল বেঁধে তুলে নিলাম—বাউরার মত। স্নান করে সেই মাটি নিয়ে বাট থেকে উঠে এলাম। একটা আস্তানা কোথাও দেখে নিতে হবে। কাঁদায় তালটা মাপায় দিয়ে শুরে পড়ব ছপ হর বেলা। ঝাঁ—ঝাঁ করছে রোদ। চলেছি আমি। হঠাৎ, একটা কোঠির দাওয়ার খেলছিল এক খোকা—লে আমাদের ডাকল—এই। এই মাটিওলা। এই!

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর দোর খুলে বেরিয়ে এলেন এক মাজী। বললেন—বাঁচলাম, দাও তো বাবা মাটি।

গোটা তালটাই নামিয়ে দিলাম আমি। মাজী বললেন—এতনা নেহি। চার পয়সার।

বাবুজী এই স্ক্রু হয়ে গেল আমার ব্যবসা। গঙ্গাজী আমার গঞ্জিত ধন আমাকে দিয়েই চলেছেন। আমি নিয়ে—তাই বেচি আর খাই। ধেরে-ধেরেও বাঁচে বাবুজী। তাই থেকে দশটি করে টাকা আমি লছমনিয়াকে ভেজে দিই। লছমনিয় পেরেছে তার ছেলেকে—আমার তো সুসহরের বেটীই সব। ওকে পাঠিয়েও আমার থাকে। বা থাকছে—তাও সব মরবার আগে সুসহরের বিটায়াকে পাঠিয়ে দেব।

একটু বাড় নেড়ে বললে—লে অনেক হবে, ইয়া—অনেক হবে। এই

মাটি

এত পরশা। আনি দু-আনি আর পরশা। দরবার আগে লছমনিয়াকে
জেবে দেব। লছমনিয়া—দুগহরকে বিটীয়া, পাকাবেঁর রহনেওয়ার মত
লবা। লে ওর লেড়কাকে দেবে।

অভিজুত হরে ভাবছিলাম। চমক ভাঙল ওরই হাঁকে।

অপরান্নের প্রারম্ভকালের মাধ্যমটুকু বেন অকস্মাৎ চমকে উঠল তীক্ষ্ণ
কণ্ঠস্বরের বেসুরা ভঙ্গির হাঁকে।

—মাটি—চা—ই, মাটি—ই।’

মেওয়ারাল ? না—এ আর একজন। এমনি ভাঙা চোরা বেহ।
এমনি করেই হাঁকে চলেছে। এও হয় তো মাটি হারিয়ে—মহানগরীতে
মাটি কুড়িয়ে—বেচে বেড়াচ্ছে দোরে দোরে—মাটি—চা—ই!

অস্বাদান

চৌবিকীতে গন্ধার জনতা জমে উঠেছে। বিবে ও অমৃতে বেশানী
জীবন যেন প্রকাণ্ড একটা কড়াইয়ে টগবগ করে ফুটছে। কতটুকু বিষ
কতটুকু অমৃত এ নির্ণয় করতে বিধাতা পারেন কি না তিনিই জানেন
কিন্তু মাহুব পারে না, বিচক্ষণতম রসায়নিকও না। গোটা ময়দানটাই
যেন একটা বিরাট কড়াই। সেদিন পুণিশের ডেপুটি কমিশনার বড়ভা
দিয়েছেন—রাত্রে গোটা ময়দানটা একটা রহস্যপুরী হয়ে ওঠে। রহস্যপুরী
বলতে তিনি অবগুই বলেছেন অপরাধতত্ত্বের রহস্যের কথা। অন্ধকার
জমে থাকে গাছের তলায়—কলকাতা মহানগরীর অস্তরের অপরাধ-
প্রবণতা সন্ধ্যার অন্ধকার হওয়ারাত্র সারীশ্বপের মত গর্ত থেকে বেরিয়ে
ছুটে আগে এখানে অবাধ বিচরণের অন্ত। বিষম পড়ে হেসেছিল।

কয়েকদিন আগে সে বসেছিল কার্জন পার্কে। সুরেন্দ্রনাথের
মূর্তির নীচে বৈদীটার অন্ধকারে চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ এলে জুটল
সেখানে বেদের মেয়ে ক'জন আর জনতিনেক রাত্রে অন্ধকারে উল্লাস-
প্রয়োগী। বেচারীকে উঠতে হল। এসব তার অজানা নয়। তীক্ষ্ণ
দৃষ্টিতে এদের সে বেখেছে। বেবেদের মেয়েদের উৎপাতে কার্জন
পার্কের দক্ষিণদিকের রাস্তাটার পথ হাটা চলে না। শুধু তাবেরই
উৎপাত নয়। ভক্ত ঘরের কুমারী মেয়ের মত শেখে মেয়ে-পুরুষে বুয়ে
বেড়াচ্ছে।

সেদিন তার অন্ধকারের নেশা লেগেছিল। মনে আছে তিনি ছিল
অবাকতা, আকাশে ছিল মেঘ, সে অন্ধকারের নেশায় সামনের ঘাটের

মরদান

মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল। মনুষ্যমেষ্টের তলায় সিঁড়ির উপর বসে আছে—
কতকগুলিই লোক। নিস্তব্ধ হরে প্রেতের মত বসে আছে। মধ্যে মধ্যে
জগন্ত বিড়ি সিগারেটের আশ্বাস জলে জলে উঠছে। আরও একটু
এগিয়ে গেল সে।

একটা গাছের তলায় গিয়ে চুপ করে বসল।

কয়েক মিনিট পরই একজন এসে গাছটার ওষিকের তলায় দাঁড়াল।
একটি মেয়ে। বিব্রত হ'ল বিমল। ভাবলে উঠে পড়ে বা গলার সাড়া
দিয়ে জানিয়ে দেয় নিজেব অস্তিত্ব। তার আগেই মুহূর্তে সে ডাকলে
নেপী! বিমল উত্তর দেবে কিনা বুঝতে পারলে না। মেয়েটি আবার
ডাকলে—নেপী! আমি এসেছি! এগিয়ে এল সে বিমলের দিকে।
চমকে উঠল এক বলক আলো, টর্চের আলো। মুহূর্তে নিভে গেল।
শুধু নিভেই গেল না, সঙ্গে সঙ্গে টর্চটা পড়েও গেল মাটিতে, মেয়েটি অস্ফুট
কণ্ঠে বলে উঠল—বিমলবাবু!

কে?

—আম্বন্তে কথা বলবেন।

—কিছু কে—

—আমি—নীলা সেন—এখন নীলা চ্যাটার্জী।

—ও! বিশ্বাসের আর অবধি রহিল না বিমলের। নীলার মত মেয়ে
এখানে? এই অন্ধকারে এই পাপের রাজ্য কলকাতার মরদানের
গাছতলায়? সে প্রশ্ন না করে পারলে না—তুমি এখানে?

—নেপীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

নেপী নীলার সহোদর, নাজনৈতিক দলের কর্মী, সে আত্মগোপন করে
রয়েছে।

—তাই নেপী আসছে বোধ হয়।

একটা পেন্সিল টেবের আলো একটু দূরে জলেই নিভে গেল। একটি
সাদা মূর্তি নড়ছে।

—আমি চলি * বিমল উঠে পড়ল।

—দেখা করবেন না নেপীর সঙ্গে ?

—না।

খানিকটা এসে বিমল দেখলে—নেপী আর নীলা দুজনে হন হন
ক'রে চলে যাচ্ছে—দক্ষিণ মুখে। বুঝলে সে, নেপী তাকে বিশ্বাস করতে
পারেনি। আর একদিন দেখেছিল—আর একজনকে। ভিক্টোরিয়া
মেশোরিরেলের কাছাকাছি একটা রাস্তার ধারে গ্যাল পোষ্টের নীচে
দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে পাথরের মূর্তির মত। সে তাকে দেখেও
চমকে উঠেছিল। মেয়েটি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছুটি ছোকরা তার
চারিপাশে ঘুরছে। এ মেয়েটিকেও বিমল চেনে। মিশ্রা তাকে দাঁড়া
বলে, মিশ্রাকে সে ভুলবে কি করে ? মিশ্রাও রাজনৈতিক দলের কর্মী।
সেও আত্মগোপন করে আছে। বিমল তার সামনে এসে একটু দূরে
দাঁড়াল। মিশ্রা তেমনি অচঞ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। মুখের
এতটুকু পরিবর্তন হল না। চোখের দৃষ্টি কিংল না, জ্র নড়ল না।
অচর্চ্যা হল না বিমল। কোন সহকর্মীর অন্ত দাঁড়িয়ে আছে। মনে
মনে অজস্র আশীর্বাদ জানিয়ে নে চলে গেল আপনাব পথে।

সে দিন মনে পড়ে গিয়েছিল—এমনি একটা গাছতলার শহীদ
মলিনী বাগটা তিনদিন পড়েছিলেন—অগ্রহ অবস্থার। কলকাতার
বিগত কালের বিপ্লবের নাটকের কত খণ্ড দৃশ্যের পটভূমি এই রাজির
ময়রান—তার হিসাব নাই।

ময়দান

তবে ডেপুটি কমিশনারের কথা এক হিসাবে পুরোপুরি সত্য।*

যে কালে নলিনী বাগচী গাছতলায় পড়েছিলেন অসুস্থ অবস্থায়—
এই ময়দানের গাছতলা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল, সে কালের আত্মরক্ষা
বিভাগের দৃষ্টিতে নলিনীর আচরণ রাজনৈতিক অপরাধ বলে গণ্য ছিল।
এ কালে নেপী—মিশ্রা—এরাও রাজনৈতিক অপরাধের জন্ত দায়ী।
আবার ওরা যদি কখনও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে পারে—
তখন আর কোন দলের কর্মী এমনভাবে এই গাছের তলার দাঁড়িয়ে
থাকবে। শহীদেবী নিজেদের দলকে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে দিয়ে
চলে যাব; যারা থাকে—অধিকার বাগেব হস্তগত হয় তখন তারাই
এখানকার অপরাধ বলনের তার গ্রহণ করে। ময়দানের অন্ধকারে
এমনভাবেই বনবটার কীকে কীকে ছ'চাবটি তারাকুল ফুটেবে।

বিমলই হয়তো তাদেরও দেখে খুঁজ হবে এমনভাবেই।

ভাবতে-ভাবতেই চলেছিল বিমল।

হঠাৎ সামনে থেকে কেউ নারী কণ্ঠে বললে—একটু
দাঁড়ান তো!

থমকে দাঁড়াল বিমল। মনুমেণ্টের উত্তর দিকে—এপাশে ভবানীপুর
খেলার মাঠ—এ পাশে বাস্টাড়াবাব জায়গা। মধ্যে যুদ্ধের সময় তৈরী
রাস্তাটা। সেই রাস্তায় কাঁধে একটা কিছু নিয়ে একটি মেয়ে চলে
আসছে। দক্ষিণদিক থেকে আসছে। অস্পষ্ট আলো। তবু বিমল
মেয়েটিকে বেন চিনতে পারলে। মেয়েটিকে প্রায়ই দেখা যায়
এলগ্যান্ডে। একটি বুসবু ছেলে কাঁধে ফেলে মেয়েটি কার্জন পার্কটা
বেড় দিয়ে বোরে। এলগ্যান্ডে ট্রাম-চক্রটার ঘুরে বেড়ায়। প্রথম বিন
বিমল দেখে মনে করেছিল—কোন গৃহস্থবধূ। সমস্ত চেহারাটার তার

ময়দান

একটি নিরপরাধ জীবনের ছাপ মাঝানো আছে। মনে হয় একটি গ্রাম্য বহু স্তম্ভ কলকাতার এলে হরতো পথ হারিয়েছে।

হু'দিন একদিন অন্তর বিমল এখানে আসে। কলকাতার জীবনকে বেখে ৬ এরপর যতদিন সে এসেছে গ্রাম প্রতিদিনই সে দেখেছে মেয়েটিকে, দেখেছে ঘুমন্ত ছেলে কাঁধে কলে নিরীহ চেহারার একটি মেয়ে ঘুর বেড়াচ্ছে এসপ্লানেডে, কার্জন পার্কের চারিপাশের বাস্তায়। দেখে ওর ভুল ভেঙ্গে গেছে। হয় পেটের দ্বারে নয় পেশার ও নেশার ঘুরে বেড়ায় ও। ছেলেটা এমনভাবে ঘুমোর; সস্তবস্ত ঘুমের কোন ওষুধ বা ওষুধ।

মেয়েটিকে চিনতে পেবে সে অকুচিত কালে, দাঁড়িয়েছিল থমকে —চলতে আবস্ত কবলে। পিছন থেকে মেয়েটি বললে—করা করে একটি পাড়ান। বিপদে পড়েছি আমি। কর্তব্যে আকৃতি ছিল তার। সে আকৃতি অভিনয় বলেই মনে হ'ল বিমলের। মেয়েটি এগিয়ে এল, দ্রুত পড়েই এগিয়ে এল। তাপাচ্ছিল, একটু জোরেই চেঁটেছে বিমলকে ধরবার জঙ্গে।

বিমল বললে—কি হয়েছে আপনার? কি বলছেন?

—একটু এগিয়ে দিন আগাকে। টাম পর্যন্ত।

কু কুচিত কবে বিমল বললে—এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে কোণায় গিয়েছিলেন আপনি?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে বললে—ক'জন হিন্দুস্তানী আমার পিছু নিয়েছে।

—অন্ধকারে একলা মাঠের মধ্যে ঘুরলে—এ তো বড়ইট।

—টামের ওখানে গেলেই আলোব মধ্যে আর কিছু করতে পারবে না আমার!

ময়রান

বিমল আর কোন প্রশ্ন করলে না। মেরেটিকে সঙ্গে নিয়েই হাঁটতে লাগল।

আলোকিত এসপ্ল্যানেন্ডে এসে মেরেটি মুহূর্তে জনতার মধ্যে মিশে গেল। বিমলকে একটি কথা পর্যন্ত বললে না। বিমলও কথা বলার অবকাশ পেলো না, কথা বলবার জন্তই সে যখন পিছন ফিরলে তখন সে তার পিছনে ছিল না, কখন তার সঙ্গে পণ্ডিত্যাগ করেছে বিমল জানতেও পারে না। একটু সন্ধান ক'রে দেখতেই নজবে পড়ল ওই চলে যাচ্ছে।

পরের দিনও বিমল দেখলে মেরেটি যথানিয়মে এসপ্ল্যানেন্ডের জনতার মধ্যে থেকে কার্জন পার্কের ছমছমে আলো-আধারির রহস্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল—সুন্দরবর্শন স্রীমূপের মত, সবুজ লাইউগা সাপের মত গাছের পাতার সঙ্গে মিশে গেল যেন।

দু'দিন পর সেদিন একেবারে যুথোযুথি দেখা হয়ে গেল। কোলে ছেলে নিয়ে হাত তুলে নমস্কার করার উপায় ছিল না—একটু হেসে মুখে বললে—নমস্কার!

বিমল কোন উত্তর না দিয়েই চলে গেল পাশ কাটিয়ে। চলে যাচ্ছিল সে চোরিঙ্গীর দিকে। কিছুদূর এসে তাকে দাঁতে হ'ল রাস্তার মোটরের প্রবাহ চলেছে যেন। মিনিট দুয়েক দাঁড়াতে হল। এর মধ্যেই সে এসে তার পাশে দাঁড়াল।

—শুভ্রন।

চমকে উঠল বিমল।—কি?

—নমস্কার করলাম। আপনি একটা কথা না বললেই চলে এলেন?

—এলাম। আপনার সঙ্গে এভাবে আলাপ করবার জো কোন হেতু নেই।

মেয়েটি বললে—দীন-দুঃখীকে দয়াও তো করে থাকেন।

—দয়া? বিব্রিত হ'ল বিমল। ঠিক খুঁজে পেলেন না, এ কথার কি উত্তর দেবে।

—কিছু খাওয়াবেন আমাকে?

—খাওয়াব?

হ্যাঁ। আজ আর—। মেয়েটি হাসলে। আশ্চর্য্য অভিনয় করতে পারে মেয়েটি। এমন ব্যঙ্গ মেশানো বেদনা কুটে উঠল তার হাসিতে যে, তার বোধ হয় তুলনা হয় না বলে মনে হ'ল বিমলের।

বিমল পকেট থেকে একটি টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বললে—এই নিন। যা খুশী হয় খাবেন।

মেয়েটি হাত সরিয়ে নিলে। বললে—না। টাকা আপনার রাখুন। খাওয়াবেন তো—চলুন না—কোন হোটেলে—

—না।

তবে মোড়ে ওই কিরিওয়ালারা খাবার বেচছে—দহি বড়া,—কচুরী।
—চলুন পেঁতে খেতে আপনাকে বলব আমার কথা। আমার অনেক জুখ।

চৌবন্ধীর পশ্চিম দিকে পার্ক-করা মোটরের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কৌতুহলী দর্শকেরা আশেপাশে ভিড় জমাত্তি। বিমল বিব্রত এবং ক্লান্ত হয়েই বললে—চলুন।

কার্জন পার্কের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে খাবারের কিরিওয়ালারা অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ। চাকা-ওয়াল হাত-গাড়ীর ওপর খাবার সাজিয়ে তার উপর গ্যাসের আলো জ্বলে বিক্রী করে। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকেরা এখানে বেশী ভিড় করে। ঘেরাে আঙ্গুল দেখায়—খাবারওয়ালারা তুলে চৌষ্ঠার উপর দেয়।

স্মরণ

খাবারওয়ারালার হাতে একটা টাকা ধরে বিমল বললে—হাঁ দা
খেতে চান বাও ।

মুহুর্তে মেয়েটি বা হাত দিয়ে আমার খুঁই চেপে ধরে বললে—না ।

—মানে ?

—খেতে পাবেন না ।

রুট হয়ে উঠল বিমল ।—কেন ? কেন এমন-ধারা বিরক্ত করছেন
আমাকে ?

—বিরক্ত ? বিরক্ত হচ্ছেন আপনি ?

—হ্যাঁ—হচ্ছি ।

একটা বিচিত্র দৃষ্টি—তার চোখে খেলে গেল । একটা বিদ্যুৎ চমকে
উঠল যেন । বিমল গ্রাহ্য করলে না, চলে গেল । কিন্তু ট্রামের অগ্নি
দাঁড়াতে হ'ল তাকে । বেহালা বা আলিপুরের ট্রাম বাচ্ছিল । মেয়েটি
পাশে এসে দাঁড়াল । বললে—ইচ্ছা করলে মিছিমিছিও অপব্যয় করতে
পারি আপনাকে । কিন্তু না, তা' করব না । যান আপনি, চলে যান ।

দিন পনের পর । এ পনের দিন বিমলের এস্প্র্যানেডে যাওয়া ঘটে
ওঠে নাই । কয়েক দিন গিয়েছিল বাইরে, ফিরে অগ্ন্যুৎ হয়ে পড়ে কয়েক
দিন বাইরে বের হরনি । সেদিন সন্ধ্যায় পরিচ্ছন্ন আকাশ এবং জ্যোৎস্না
ওকে ঠেলেই যেন ধর থেকে বের করলে ।

এস্প্র্যানেডের আলোর মধ্যে জ্যোৎস্না নেই । সে গিরে বলল মজু-
মেক্টের ডলায় । মাঠের খালের উপর জ্যোৎস্না পড়েছে—খালের ডগাগুলিতে
অত্যন্ত ক্ষীণ ঝিকিমিকি ছটা বেজেছে, একটি অপরূপ কোমল স্তম্ভ লাবণ্য

মরুভূমি

যেন গঁলে এলিরে পড়েছে তৃণান্তরনের ক্রীম গাষণের উপর। বড় বড় গাছগুলির উপরের পাতাগুলিতে ছটা পড়েছে। কিন্তু মরুমেণ্টের চারিপাশে—নানা বিচিত্র খেলা চলছে। জন কয়েক বলে চাঁদের আলোর তাল খেলছে। সজ্জাত কুরা। জন কয়েক মিলে গাভা খাচ্ছে। আরাপতি হিসেবে দম্পতি কিনা কে জানে—ছোট যুগল রয়েছে, তারা প্রায় নিঃশব্দ হয়ে বলে আছে। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট হল এসে যুরপাক খেয়ে দেখে যাচ্ছে, যুগল দুটিব সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থুয়ে চলে যাচ্ছে। তর্কাতর্কালগাভের কলহ বাধল। কলহ ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছিল, একজন আর একজনকে মেরে বলল এক চড়। বিমল উঠে পড়ল। এখানে আর বলা বাবে না।

এগিয়ে এসে সে বলল একটা গাছতলায়।

একটা পায়ের শব্দ, নরম বাতের উপর কোন পদিক চলছে। শব্দ এসে বিমলের পিছনেই থামল। বিমল মুখ ফিরিয়ে দেখলে—সেই মেরেট, তাবই পাশে সে বলে পড়ল।

বিমল ভিন্ন পেলে আজ।

বলে সে বললে—মরুমেণ্টের সামনের রাস্তা থেকে দেখেছি আমি। পিছনটা দেখেই চিনেছি। একবার দেখলে আর আমার ভুল হয় না।

—কিন্তু কি চাও তুমি আমার কাছে? আজ আর সে তাকে আপনি বলে সম্বোধন করলে না।

সে বললে—টাকা আর চাইব না আপনার কাছে। বাবা: সেদিন যে রাগ আপনার!

—মিছে কথা।

—না। ছেলটাকে কোলে নিয়ে ঘোষটা টেনে, হাত বাড়িয়ে বললে

ময়দান

—কি বরসী মেয়ের হাতে সন্ধ্যা থেকে একটা টাকার চেয়ে অনেক বেশী পড়ে।

—তাও কর ?

—করি বই কি। না হ'লে পাপ করতে হয়।

বিমল ব্যঙ্গ-হাসি হেসে তার মুখের দিকে তাকালে। সে বললে—
—বারবাব না-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে সর্কান দিলে। অস্বীকার করে সে দৃঢ়ভাবে বললে—না। পাপ আমি করি না।

—তবে যোজ সন্ধ্যায় এমন ক'রে ঘোব কেন এই ময়দানেব আবছায়া ভরা রাস্তায় রাস্তায় ?

—কেন ঘুবি ? সে হাসলে একটু, তারপরে বললে—

* * * * *

সেদিনও ঠিক এমনি রাত্রি ছিল—এমনি চাঁদনী রাত—বাধা-বিদে
বিমল প্রশ্ন করলে—কিন্তু তোমার নাম কি ? কোথায় বাড়ী' ?

—নাম আমার স্তম্ভা। বাড়ী মানে, বেশ কোথায় তা' জানি না।
জ্ঞান হওয়া অবধি থাকি কলকাতায়। বাবার নাম জানি না। মা
আমার বাবার' ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল—একথা জানি। তখন না কি
আমার বয়স দেড় কি দুই। বে সোকটির কাছে মা থাকত—তাকে অন্ন
অন্ন মনে পড়ে। তাকেই বলতাম বাবা ! মা পুণ্য তিনি করে থাকুন,
আমাকে কিন্তু তিনি বড় ভালবাসতেন। ঘুবি বলে ডাকতেন। ভাল
ভাল জ্বক এনে সাগিরে মায়ের হাত ধরে রাতদিন এখানে বেড়াতে
আসতেন। এ আদর্শগাটা ছেলেবেলা থেকে আমার চেনা। সে সময় কি

সরস্বতী

কুলই ফুটত এই পার্কে। তারপর হঠাৎ তিনি গেলেন মারা। আমার
বয়স তখন চৌদ্দ পনেরো।

মাকে বলল গেলেন—সুখিকে গান-বাজনা শিখিয়ে—লেখাপড়া
শিখিয়ে—ওই সন্ধ্যার তার নেবে একদিন। গানের গলা ভাল, সুখি
তীক্ষ্ণ—নিজের পথ ও নিজেই করে নেবে।

একটু চুপ করে ভেবে নিলে কিছু। তারপর বললে—বোধ হয় মা
আর আমার পালক পিতা যা করেছিলেন তাতে যা পাপ তার বেশীটা
ছিল আমার মায়েব। আমার মনে আছে—বাবার—হ্যাঁ বাবাই বলত
তাকে, বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পর একদিন পাড়ার মহিলা সমিতির এক-
জন এসে মাকে বললে—ভুললাম আপনি খুব অসহায় অবস্থার মধ্যে
পড়েছেন। হঠাৎ স্বামী মারা গিয়ে—

মা মাঝপথে তাব কথাই বাবা দিয়ে বলল—কে বললে আপনাকে ?

মেরেট ভড়কে গেল। বেশ একটু অস্বাভাবিক হয়ে মায়ের মুখের দিকে
চেরে'রইল।

মা বললে—স্বামী নিয়ে চিরকাল ঘর আর কে করে ?

মেরেট বললে—তা বলি নি। বলছি—একলা মেরেছেলে—মেরে-
টিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছেন—

—হ্যাঁ, তা হয়েছে। কিন্তু আপনি কে ?

—আমি পাড়াবই মেরে। এ পাড়ার মহিলা সমিতি থেকে এসেছি
আমি।

—মহিলা সমিতি ? জামা দেলাই, চোঙা তৈরী—? না ভগব
আমি পারবও না, দরকারও নেই। তেমন অবস্থা আমার নয়।

মেরেট হেসে এবার বললে—বেশ তো। সে সব করে কাজ কি

ময়মনসিংহ

আপনার? আপনার ঘরের সবকিছু কোন ব্যাবস্থা, যদি করতে হয়—
বলুন। পড়ছে তো?

—ঘরেই পড়ছে। আর গান শিখছে।

—পড়ার অঙ্কে আমাদের ওখানে ক্লাশ আছে সেখানই দিবেন।

—না—না। ও সবের মধ্যে আমি নেই। দু'দিন পরে কাঁধে ব্যাগ
ঝুলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরবে—পরোপকার ক'রে। ওকে আমি সিনেমার
দেবার জন্ত তৈরী করছি।

মেরেটি' চলে গেল।

আমি সেদিন অস্বাক হয়ে গেলাম। চোখে একটা ঘোর লেগে গেল।
সিনেমার নামব আমি? দেওয়ালের গায়ে কাননবালা, সন্ধ্যারাণীর মত
ছবি থাকবে আমার? এমনি দেখাবে আমাকে!

বাবা বেঁচে থাকতেই একটা হারমোনিয়ম কিনে দিয়েছিলেন
আমাকে। সারা দিন চৈতাম—সা—রে—গা—মা—। সারেগা,
রেগামা; সা—সা—রে—রে!

বলতে বলতে হেসে উঠল সে।—জানেন, আমাদের পাশের
বাড়ীতেই যারা থাকত, তারা শেষ পর্যন্ত অদীর হয়ে একদিন টিন
বাজানো শুরু করলে। আমিও আবস্ত করতাম—সা—রে—গা—মা—
ওদের বাড়ী থেকেও অমনি শ্রুত হত—ট্যাং—ট্যাং—ট্যাং—ট্যাং।

আজ হাসছি—সেদিন কিন্তু চোখে জল আসত।

ক্রমে গান শিখে গেলাম কিছু কিছু। দু-তিনটে গান বেশ ভাল
গাইতে শিখলাম। টিন বাজনাও বন্ধ হল। অবিশ্রুতি আমি গান
শিখলাম, আমার গান শুনে ওরা লজ্জা পেলে, এ বলে নয়। গান
গাইতে, আমি ক্লাস্ত হলাম না কিন্তু টিন বাজিয়ে ওরা ক্লাস্ত হ'ল।

সরস্বতী

যখন ওক্স টিন বাজুতি, তখনও আমি খামতাম না, বরং ওদের বাজনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোর দিয়ে গান গাইতাম, পর্দা চড়িয়ে দিতাম। ওস্তাদও একজন জুটেছিল—বাবার বন্ধু। বাবার মৃত্যুর পর সেই ছিল আমাদের সংসারের একমাত্র বন্ধু। অকপট বন্ধু। আপনার বুদ্ধিমত্তা পরামর্শ দিত সে। সেই মায়ের বাথার চুকিয়েছিল—সিনেমার দেওয়ার কথা।

সিনেমার বারা নামে, তাদের সুখ ঐশ্বর্য তো আলিবারার গল্পের ডাকাতদের গুহার ধনসম্পদের মত। আমার ওস্তাদ বলত—দুয়েছ না সুখির মা—একবার ছবিতে নামাতে পারলে হয়, বাস—চিচিং-কীক।

আমাকে ডাকত সে—শিব দিয়ে—‘সু-সি।’

আমাকে বলত—‘বরবার যেমন তেমন ক’রে কাপড় পরবি নে। ফেরতা দিয়ে কাপড় পরবি। চব্বিশ ঘণ্টা এমনি করে কাপড় পরবি। পলার মালী, পুঁপিব ভুল, কাঁচের কঙ্কন এনে দিত।

বাবা একটা বড় আরনা কিনেছিল এক সময়, পুরণোই কিনেছিল, সেটার ভেতরটার ছ্যাকরা-ছ্যাকরা দাগ ধরে চেহারা ভাল দেখা যেত না; আমি সেই আরনাটার সামনে সেই সব পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজে থেকে দেখতাম—নাচতাম। একটা ছবির গান—ভারী প্রিয় ছিল—“ভালো না লাগে তো দিলো না মন।”

ওস্তাদ বলত—আমার কিন্তু তোর গানে সুর দিতে হবে। তাকে জেদ ধরতে হবে।

লোকটা পাগল ছিল। বুঝলেন না। নিজের কদরও জানত না, আমাকে ভাবত—কাননবালার চেয়েও আমি নাম করব সিনেমায়।

আমিও তাই ভাবতাম। মা-ও তাই বিশ্বাস করত। এক একদিন

মরহাম

রাজে মা ওস্তাদের সঙ্গে বলে পরামর্শ করত, আমি সুনতাম আর বাড়ীর সাহসে দেড় হাত ফালি বারান্দার বলে দু'হাত চওড়া গলিটার মাথার উপরে কীক দ্বিগুণে আকাশে জ্যোৎস্না থাকলে আকাশ দেখতাম, কুম্পক হলো তারার ঝিকি মিকি দেখতাম, মেঘল' হ'লে এসে কখন বিজ্ঞান চমকাবে তারই অপেক্ষা করতাম।

মা বলতেন—গাড়ী থাকলে কংকাতার বাইরেই ভাল। তাছাড়া টেলিফোন থাকলে ভাবনা কি।

ওস্তাদ বলত—শহরের বাইরে হলে আরগ'র ভাবনা কি? ভাল আরগা আর সিনেমার ষ্টুডিওর লাগাও, টালিগঞ্জের বিজেন্ট পার্ক, কি তার আশেপাশে—।

মা বলত, কলকাতার বাইরে দুঃখ শুধু মাটিরতলাব ড্রেনের।

—কিন্তু ভাবনা নাই। ওসব যা ব্যবস্থা হলেই অংকাল।—
আমাকে কিছু একখানা ঘর দিতে হবে।

—নিশ্চয়। মইলে সব দেখবে সুনবে কে? তাহলে কাল সকালে খুব তোরে ওকে তৈরী কবে রাখব।

—একেবারে ষড়ি ধরে যেতে হবে।

একজন ডিরেক্টর নাকি দেখতে চেয়েছেন আমাকে।

গেলাম! মোরবেলার উঠে সেজেগুজে বেরুলাম। সাজতে তখন শিখে গিয়েছি। কখুচুল সাধা মিলের কাপড়, টাইট-হাতা টকটকে লাগ রঙের ব্রাউল; মোট কথা একেবারে মর্দার মেয়ে। কাঁধে প্যাণ্টিকের জ্যানিটি ব্যাগ নিলাম কুলিয়ে।

ডিরেক্টর বাংলাদেশের মস্ত ডিরেক্টর। দেখে কিরিয়ে দিলেন।
বললেন—আমি যে রকমটি খুঁজছি, সে রকমটি নয়।—তবে—

ময়দান

তবে এলেছ, বলছ—অভাব। তা—ছোটখাটো কিছু বিতে পারি। তাও পারবে কিনা আমার সম্বন্ধ আছে।

ওস্তাদ সেখানে কে'চোর মত নিরীহ। মূণে একটিও তার কথা ফুটল না। চূপ ক'রে গাড়িয়ে হাত কচলাতে লাগল।

ডিরেক্টর বললেন—যেদিন কাজ পাকবে, সেদিন দশ টাকা হিসেবে পাবে। বুঝেছ?

ওস্তাদ বললে—ইয়েস স্যার। তাই হবে স্যার।

বাড়ী এসে ওস্তাদ লাকালে। বললে—ও হ'ল এটা কাজ। ও সবাবই মাংস খায়—ওর মাংস ছনিয়ার কেউ খেতে পারে না। কিন্তু ধর্মের কল আপনি নড়বে। বিক না ছোট পাট। এতেই বাজী-মাংস হয়ে যাবে। একজন নাম-করা সিনেমা অভিনেত্রী নাম ক'রে বললে—ওকে ছোট্ট একটা পাট দিয়ে নামিয়ে ছিল গিরিজাবাহু ডিরেক্টর। মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিল। কিন্তু ধর্মের কল বাতালে নড়ে গেল। এক পাট করেই বাস বাজীমাংস। যেদিন বই পুগলে, তার তিন দিনের মধ্যে চার চারটে কন্ট্রাক্ট। একেবারে হৈ—হৈ—রৈ—রৈ। এও ঠিক তাই হবে। বললই শিল দিয়ে ডাকলে—হু—সি।

সবচেয়ে পাগলামী করলে সে—যখন অ'মায় পাট'দিয়েন ডিরেক্টর। একটি পাড়াগায়ে নতুন বউয়ের পাট'দিয়েন।

ওস্তাদ বললে—আজ্ঞে না স্যার। মডার্ন মেয়ের পাট'ভিন্ন ও নামবে না।

ডিরেক্টর বললেন—ওকে মানাবে না। এতেই ওকে ভাল মানাবে।

—না। ও হবে না স্যার। ওড-বাই টু ইণ্ডর চ্যারিট স্যার। দশটা টাকা বন ক'রে ফেলবে দিয়ে পাগল আশাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

ময়দান

মা বললে—উঠিয়ে নিয়ে এলে—কিন্তু।

—কিন্তু কিসের? আবার ঠিক করছি আমি। কালই।

ওস্তাদ পাগল হলেও করতকর্ম। লোক। তিনদিনের দিন নতুন ডিবেকটারের কাছে নিয়ে গেল। পাটও পেলাম ওস্তাদের মনের মত। আমারও মনেব মত। কলেজের মেয়ে, স্বদেশী ক'রে বেড়ায়। একটা খবরের কাগজের আপিগে ষ্টাইক হয়েছে—পিকেটিং করেছে সেখানে। পাট করলাম। ছবি খুলল। দেখতে গিয়ে নিজেকে দেখেই নিজের খেঁচা হ'ল। ঠিক যেন একটা হাড়গিলের মত কুংসিত একটা মেয়ে আমি। লোকে টিটকাবী দিয়ে উঠল। আমি কেঁবে ফেললাম। ওস্তাদ গাল দিতে লাগল ক্যামেরাম্যানকে।

বাল, আমার সিনেমার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

দিন কয়েক ধরেই ওস্তাদের সঙ্গে মায়ের পরামর্শ চলল। মা বললে ভোরবেলা উঠে তৈরী হবি। বেরিয়ে যেতে হবে ওস্তাদের সঙ্গে। পাড়ায় বলবি চাকরী পেরেছিস। সকাল-সন্ধ্যা ডিউটি। কিরবি—আটটা ন'টায়। আবাব বেরবি সড়ে পাঁচটায়। বুঝেছিস?

সেমিন বুঝিনি। পরে বুঝলাম—অনেক। মায়ের মনের ছিল একটা অদ্ভুত ভঙ্গি। পাড়ায় মা ছিল একা, কারুর সঙ্গে বনাবস্তি ছিল না। আমাকে বলত, কারুর সঙ্গে মিশবি নে। খবরদার! ওরা আমাদের ঘেঁরা করে। আমরা পাগী। আমরা গরীব। একদিন ওদের দেখিয়ে দোব আমি।

দোষও হয়তো ছিল না। পাড়ার লোকে হালত—আমার এই চালচলন দেখে। আমারও রাগ হ'ত। চোখ কেটে জল আসত।

মা পাড়ার লোকের কাছে মান রাখবার জন্তে এই নতুন ব্যাবস্থা

কল্পবান

করলে। আবারও জল লাগল। তোরবেলা শেষেওকে বেরিয়ে
কেতায়। পথে পথে ঘুরে পার্কে ঘলে নকানবেলাটা কাটিয়ে দাড়ী
কিরতায়। ওতাই পথে আবার ছেড়ে দিয়ে চলে বের। বকালে একটা
কাক ছিল তার। • •

নকানবেলা আবার নকে থাকত সে। ঘুরতায় পথে পথে দিনেবার
শাশনে কাটিয়ে দেওয়ারলে আঁকা ছবি দেখতায়।

একদিন বা বললে—আর তো চলে না ছবি। কল্পবান বা ক'রে
চলল—সে কল্পবান জানেন।

উপায় আবিষ্কার কি করব? ভেবে আবিষ্কার কি উপায় পাষ?

মায়ের চোখ হঠাৎ জলতে লাগল। আঁখি তার পেগায়। মা আবার
হাত চেপে ধরে বললে—এক উপায় আছে।

—কি হল?

মা বললে, বড়লোকের ছেলে বেধে তাকে তোতে ধরতে হবে।
ওতাই বেধিয়ে বেবে। তুই ডেকে তার সঙ্গে আলাপ করবি। তারপর।
তারপর তাকে তোকে দাঁতে হবে। বিয়ে করতে বাধ্য হবে। বড়
হয়েছিল, বুঝতে পারছিস নর। এ ছাড়া উপায় নেই।

পরীর শিউরে উঠল। মায়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।
মায়ের কথা শুনে বেবন হল তার ভেতর আবার রক্ত লাগল নাচন।
আবার পাপ কিনা জানি না। তবে নিষেধ স্বামী পৃথিবীর বাহুবের
বেলা থেকে পছন্দ করে তাকে হুঁত করে আনার মধ্যে বেশা আছে,
রক্ত নাচন আগনি লাগে, হুঁতের মধ্যে রেলগাড়ী ছুটে চলে, কান গরম
হয়ে ওঠে; বিশেষ করে বোল-লডের বছর বরনে।

ওতাই এনে দিয়ে একটা বোলা। নৌবীন চকৎকার বোলা। আর

ময়ূরান

এনে ভিলে কতকগুলো সাবান, সেন্ট, বো। ওই সব বিক্রীর অঙ্কহাত
নিরে আলাপ করতে হবে।

দেড় বছর আগে একটি মডার্ন মেয়ে যুগত কলকাতার পথে। সুনাম
দেবারা, সুন্দর পোষাক দেখলে ডেকে বদন্ত—একটু ওয়ুন।

দাঁড়াতে হ'তই। বোল-সতের বছরের একটি মডার্ন মেয়ে ডাকলে—
কোন্ ছেলে না দাঁড়াবে।

—কিছু, সাবান, সেন্ট কিছুই না।

তারপর দীর্ঘে ধীরে একটি গল্প। সত্যি গল্পই। একটু-আগটু পাগটে
বলতে হ'ত। বলতাম—ম্যাট্রিক পাশ করলাম, আশা ছিল স্কলারশিপ
পাশ। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ। পেলাম না। তবুও ভর্তি হয়েছিলাম।
ফ্রিশিপও পেয়েছিলাম। কিন্তু ফ্রিশিপ পেলেই তো পড়া হয় না। আরও
খরচ আছে। মায়ের টি-বি। বেনা হয়ে গেছে। বাবার এক বন্ধ
বেনা বিয়েছিল, লোকটা পিশাচ। সে এখন—।

চুপ করে দুখ নামাতাম।

প্রায়ই প্রশ্ন হ'ত এর পর—সে এখন কি করছে? জুসুম?

—টাকা চাইছে ফিরে। চেষ্টাযেচি করে না, মন্দ কথাও বলে না,
মিষ্টি করেই বা বলে, তার চেয়ে মন্দ আর কিছু হয় না। লোকটির
বুড়ো বয়সে স্ত্রী মারা গেছে—। বলে—।

কি বলে?

কি বলবে বসুন। আমাকে বিয়ে করতে চায়। অগত্যা এই পথ
বেছে নিয়েছি। এত বড় শহরে খেটে খেতে পারব না?

জিনিষ-বিক্রী হ'ত। হয়তো ওই ওতেই আমার জীবনের সব সমস্তা
যমটে থেত। একালের ছেলেবেলায় বত খারাপ লোকে বলে বা ভানে,

ময়দান

তাঁ তারা নয়। তারা বিশ্বাস করত আমার কথা—আমাকে সাহায্য করত, বন্ধু, বান্ধবদের কাছে বিক্রী করে দিত আমায় জিনিষ। আমার সঙ্গে দু'চারটে রসিকতা করত, খানিকটা গল্প করত। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু বিপদ হ'ল অল্প দিকে। বিক্রীর টাকা রোজকার রোজ খরচ হয়ে গেল। আমার কোলার জিনিষ সুরিয়ে খেল। যারা জিনিষ দিয়েছিল, তারা দাম পেদ না। ওস্তাদ অনেক কাঁধাকাটি করলে—
তবুও আর দিল না।

তাঁদের আশিষ পেলে বেরিয়ে সেই দিনই বাড়িয়ে আছি ফুটপাথে—
—তাবছি, একজন চেনা ছেলে এসে বললে—কই, বিন ছ'দান।

বললাম—নেই।

—তা হ'লে কাল দেখেন।

—না।

—কি ব্যাপার?

ফুটপাথে বললাম—জিনিষের টাকা ভেঙে খেয়ে কেলোছি।

—সে কি?

—যেবেন কিছু টাকা?

—টাকা? কত টাকা?

—এক-শো।

—এ—ক—শো! মাক করবেন। চলে গেল সে। আমিও চলতে শুরু করলাম। এই এলপুয়ানেভের দিকেই। ঘুরতে লাগলাম কার্জন পার্কের চারিদিকে। ছ'তিন জনের সঙ্গে বেধা হ'ল।

একজন বললে—বেব। বুকের দিকে চেয়ে বললে—সকলের সমর এইখানেই দেখা হবে। পিছনে দিব উঠল। ঠিক পিছনে পার্কের

ময়দান

রেলিংসে হেলান দিয়ে বসেছিল ওস্তাদ। আমার পিছনে পিছনেই আছে সে। সে শিব দিয়ে উঠল—হু—বি।

পিঠ চাপড়ে ওস্তাদ বললে—বাহাদুর ধরে।

হা বললে—আরও কিছু টাকার অঙ্কে বলবি।*

আমি নমস্ত হিনটী অক্লির হয়ে কাটালাম। বেন আর হয়েছে আমার। বুকের ভিতরে একটা উদ্দেশ্যে কেমন কষ্ট হ'ল। শস্যের আগে লাগান বেধে বান করতে গিয়ে হঠাৎ শাখান জ্বতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাত কাপতে লাগল—পাউডারের পাক তুলে নিয়ে।

কার্জন পার্কের কোণে দাঁড়লাম।

কতজন পাক বিতে জ্বল করল চারিদিকে। ওস্তাদ বনে রইল সামনের ঘানের উপর।

একখানা ট্যান্ডি এসে দাঁড়াল। সে বাবল। বললে—এন।

আমি নিঃশব্দে গিয়ে ট্যান্ডিতে উঠলাম। ওস্তাদও এসে সামনের ধরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে বললে—আমি গুর বন্ধ এসেছি স্যার।

সে আমার বুকের দিকে তাকালে।

আমি বললাম কি বেন, কি বলেছিলাম বেন সেই। বিড় বিড় করে কি ছোটো কথা বেন। আমার বর্কাক তখন আরে বেন পুড়ে বাজে। মাথার বিকার হয়েছে।

এই মাঠটার কোন একটা গাছতলায় সে আমাকে হাখানা নোট হাতে দিলে। বললাম দুজনে। সে প্রথম কথা বললে—কুথবে তোমার আমি ভাল তেবেছিলাম। কিন্তু—। অঙ্ককারের মধ্যেও বুঝতে পারলাম—এল হানছে।

তারপর সে বললে—বাও, তুমি বাড়ী যাও। এককম কামে

ময়মন

বিপদ আছে। যুবক : এই কথা বলবার ভেত্রেই তোমাকে নিয়ে এসেছি।
আবার যেন কে চাবুক মারলে। আমি উঠেই ছুটেতে আরম্ভ করলাম।
কাপড়ে আঁশের লাগলে যাতুয যেন ক'রে ছুটে যেতার, তেমনিভাবে
ছুটে যেড়াছিলাম। কোন দিক লক্ষ্য ক'রে নর—চীৎকার ক'রে নর—
ওহু ছুটছিলাম। আবার হাত চেপে ধরলে—ওস্তাধ—বললে, তুঝি—
তুঝি—ছিঃ! ছিঃ!

আমি হ'হাতে নখ বিরে তার বুখে আঁচড়ে বিলাম। রক্তাক্ত ক'রে
বিলাম বুখানা। আবার ছুটলাম। ছুটেতে গিরে পড়ে গেলাম একটা
নাগরি মধ্যে। হ'হিকে গাছের ডাল এসে পড়েছে। অন্ধকার থম থম
করছে, বুয়ে বুয়ে অলছে টিম-টিমে গ্যাস-বাতি। পড়ে গেলাম—উপুড়
হরে। মনে হ'ল পৃথিবী ফলছে, কিসের একটা চেউরের উপর ছোট
একখানা নোকায় মত আছড়ে পড়ে ফলছে; কিছুক্ষণ পর মাথা ফুললাম।
মনে হ'ল চারিধিকটা পাক খাচ্ছে, আলোগুলো বুরছে—লাল-নীল
অলোর বিজ্ঞাপনগুলো পাক খাচ্ছে—ঘোরে নর—আন্তে আন্তে। এক
সময় সব থামিল।

কে বললে—ওঠ। তুঝি পাগল নাকি।

দেখলাম সেই লোকটি দাঁড়িয়ে। বললে—এ পথে তুঝি এলে কেন ?
চল, এলগ্যান্ডে তোমার পৌছে যি। এ কি, এ যে কাহার একেবারে
মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভরে গেছে। লোকের সামনে দাঁড়ায়ে কি ক'রে।

আমিও দেখলাম, আবার নিজের দিকে তাকিয়ে। মনে হ'ল
ভিতরটা বাইরে কেটে বেরিয়েছে।

সে বলল—চল।

ট্যান্ডিটা দাঁড়িয়েই ছিল। ওস্তাধ শুধু এল না।

ময়দান

এসপ্লানেডে কিরিওয়ালারের কাছে একথানা বাজী, একটা সেমিফ্র কিনে একটা হোটেলের আমায় নিয়ে গেল। বললে—মান ক'রে, কাপড় আমা পাণ্টে এস।

সেমিফ্রের উপর কাপড় ফেরতা দিয়ে পরা চলে না। সাধারণ পুরুষো পাঁচ কাপড় পরে মাথা হেঁট ক'রে বেরিয়ে এসাম। দুবের পাউডার-মো খুয়ে গেছে—আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে আমাব।

সিনেমা পর্দায় হাড়গিলের মত সেই ছবি মনে পড়ল।

সে বসেছিল ঘরের মধ্যে। একথানা ঘরই সে ভাড়া নিয়েছিল এক বণ্টার অফিসে। আমি বেরিয়ে আসতেই সে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল বাঃ।

আমার মাথাটা আরও খুয়ে পড়ল গজায়। সে ঠাট্টা করছে। বিস্ময়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার মুখ তুলে ধবে বললে—বাঃ—কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমার বল তো! দেখেছ নিজেকে আহ্ননায়? এত উপর সিঁথিতে যখন চওড়া ক'রে সিঁছর পরবে, তখন মনে হবে যেন লক্ষী-ঠাকুরগাটি। চল—এসপ্লানেডে পৌছে দি। বাজী চলে যাও। এ-পথে এস না। এমন বিশ্রী লেগে—ছি!

হোটেল থেকে যখন বের হই, তখন একজন তাকে বলেছিল—আরে তুমি এখানে? এ পথে? সত্যিই তুমি?

সে বলেছিল—সত্যিই আমি প্রকৃত্যে বহু। তোমার দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে নাই। অমুমানও তোমার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়—তবে। যাক সে কথা—যেহেতুকে আমার ভাল লেগেছে।

—বান্ধবী?

—তাই।

ময়দান

আমি আড়চোখে তাঁর মুখের দিকে না তাকিয়ে পারিনি। তার চোঁটে মাথামাখি করাশে হাসি। মেয়েটি চুপ করে গেল।

তাকে খুঁজতেই আমি আছি। একেবারে যে লাঞ্জে তার আমাকে ভাল লেগেছিল—সেই সাজে। সিঁথিতে সিঁদুর সেদিন ছিল না। সিঁদুর পরেছি ষোটা করে এখার থেকে ওখার পর্যন্ত। প্রায়ই আছি। মধ্যে মধ্যে হতাশ হই। তখন কয়েকদিনে আমি না। আবার মনে ভেসে ওঠে আস্ত। আবার আসতে আরম্ভ করি।

ছেলেটা ভাড়া-করা। ওই ওস্তাদই ভাড়া করে দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা কি যেন খাইয়ে দেয় দুধের সঙ্গে। ভিখারী মেয়ের ছেলে। বা মরে গেছে। সেও বাগান পেয়েছে—আমিও নিশ্চিন্ত। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে খুঁজি। ছেলেটা কাকে খাবে। একজন ছ'জন ভদ্রলোক পেল—তাদের কাছে ভিক্ষা চাই। গল্প একটা তৈরী আছে। বলি আমার ছেলে এটা—স্বামী পলু। চ-একজন বাড়ী পর্যন্ত দেখতে গেছে। কিন্তু তাতেও ঠকেছে। ওস্তাদের কাছেই থাকি। যে গণির মোড়ে আমাকে লোক সঙ্গে দেখলেই বিছানায় শুয়ে কাতরাই। বড় ভাল লোক। বলেছে—যদি তার দেখা পাস—কিছা যদি ভুলই তুই ফরিস—তবে তার জন্তে সুবি তুই তাবিল নে। আমি আমার জাত-খেতাব দিয়ে যাব। রেশনকার্ডেও লিখিরাছে সে আমার স্বামী। এতেই চলে যাচ্ছে। তবে—। চলবে না শেষ পর্যন্ত। অথচ—

অথচ দেখুন, যে সবলেন কথা তাবছি—সে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে। শুধু একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। এখানে তার আসার কথা, আগে সে আসত। কিন্তু কে জানে—সে বেঁচে আছে কিনা!

সন্ধ্যা

বিমল তার গল্পে বিশ্বাস করে নাই। বানিকটী হয়তো দস্যু, কিন্তু কার্জন পার্কের চারিদিকে রাডের অঙ্ককারের মধ্যে লাগি বখন প্রৌঢ়-পুঁরী অশ্রীসীমের বড় আলো-আধারির মধ্যে, অঙ্ক-বিচরণে ঘুরে বেড়ায় তখন একটি কুমারী বেয়ে বগ্ন-বিক্রমার বড় বের তরুণ তাকে প্রত্যাখ্যান করে অপমান করেছিল, তাকে খুঁজে বেড়ায়—এ একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হয়েছে তার।

তবু সে তাকে সেদিন বশটা টাকা দিবেছিল।

সে সেদিন তার পায়ের গুলো নিয়ে হেসে বলেছিল—আবার যেদিন নেহাত অভাব পড়বে, সেইদিন আপনাকে ধরব।

হেসে বলেছিল—যাবেন একদিন আমার বাসার। বেথে আসবেন ওস্তাদকে। বেথবেন বিহানার শুয়ে কেমন পলু লাগে।

বিমল এলগ্যানেনডে গিয়ে সাক্ষানে মুরতে লাগল এর পর।

সে কিছু ঘোরে। কীকে হেসে নিয়ে একটু কাঁচ হয়ে পদক্ষেপে ক্রান্তি এবং কাঙ্ক্ষতা ফুটিয়ে ঘোরে। আজ ঘোরে, কাল ঘোরে, রোজ ঘোরে—কার্জন পার্কের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম দিকে চলে যায়, গাছের তলার অঙ্ককারে বিশেষ যায়, আবার আলোর নীচে ফুটে ওঠে আবার ডুবে যায় অঙ্ককারে—একটু কাঁচ হয়ে ক্রান্ত পদক্ষেপে—ওই চলে গেল পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে। জেংকারি একটি মিথ্যাবাদিনী।

—

বেদেদেদে মেদে

বারোগা বললেন, এ তুই কি করলি বল তো ?

কি করব ? নইলে যে ভোলাকে তোষরা খ'রে ফেলতে।

শিবি বেদিসানীর হুখে হানি খেলে গেল। ই্যা, খেলেই গেল, এমন তাবে চকিতে টোঁটের দুটি পাশ ঠেং দিকশিত হওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে বেকে উঠে বাওয়া এক পরক্ষণেই বিলিখে বাওয়া, একে খেলে বাওয়া ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

এমন একটা ভাল লোক, তাকে—। বারোগা আক্ষেপের গভীরতার কথা শেষ করতে পারলেন না।

শিবিও এবার বিহ্বল হ'ল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চূপ ক'রে রইল। নীরবে সে অপরাধ বেন স্বীকার করলে। মাথা হেঁট করে হাজতের মাটির উপর নখের লাগ কাটতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে বললে, তোমরা তো ছান গো! কি করল ? ভোলার কাছে আমি মরতে পারি।

বারোগাবা বললেন, বললেন, এতটা জানি না।

কিছুক্ষণ ক'রে উঠল বিকির ছোট ছোট চোখ দুটা।

বেদিসানীর হকরে শিবি। এবানকার নিখ্যাত চোর চন্দর বেদিসার তারীর ছেয়ে।

স্তিন পুখু আশে, অর্থাৎ চন্দর বেদিসার বাপ, বলের সঙ্গে এথিকে এনেছিল। তার পর এক বিচিত্র ঘটনার সংঘটনে এখানে থেকে পিঁরেছিল।

বেদের মেয়ে

চন্দ্রের বাপের হয়েছিল অসুখ। কঠিন কঠিন আগন্তুক ব্যাধি অর্থাৎ কোন কঠিন ব্যাধির আকস্মিক আক্রমণে বেহে মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠল, ওকে তারা ফেলে দিয়ে চলে গেল ভোর রাতে।

পুত্র প্রত্যাষে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন রমনগুপ্ত মহাপ্রসন্ন। চন্দ্রের বাপ যোহনকে ওইভাবে প'ড়ে থাকতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এলেন তিনি। দু'দিনের রোগতোগে সবল সমর্থ বেহথানার উপর বোগের শোষণ বা নিষ্পেষণের লক্ষণ বিশেষ ছিল না; গুপ্ত মহাপ্রসন্নের মনে হ'ল কেউ বোধ হয় কাউকে হত্যা করেছে। বেহেদের আড্ডা পড়েছিল এখানে। তারা কাল লক্ষ্যভেগে ছিল। রাতের অন্ধকারে চ'মে গেছে, সেইখানে প'ড়ে আছে এমনি একটা বেহ, তাঁর মনে হ'ল তারাই কাউকে খুন ক'রে চলে গেছে। এগিয়ে গেলেন তিনি। দেখতে গেলেন—কে? স্থানীয় কেউ কি না? দেখলেন, না, এখানকার কেউ নয়, লোকটা বেহেদেরই একজন। ওদিকে আলো ফুটে উঠে চারিদিক পরিষ্কার হয়ে উঠেছে তখন, দেখতে দেখতে মনে হ'ল লোকটা তো মরে নি। গলায় কাছটা খানিকটা যেম নড়ছে। বেহের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্নও নাই। বৈজ্ঞানিক লস্কান গুপ্ত এবার লোকটার কাছে গিয়ে ফুঁকে দেখতে দেখতে ব'লে পড়লেন পাশে। আরও কিছুক্ষণ দেখে হাত তুলে নিলেন হাতের মধ্যে।

চন্দ্রের বাপ বেঁচে উঠল। গুপ্ত বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে ওহুধের ব্যাগ আনিবো নাকে কানে অণ্ণের সন্ধিস্থলে ওহুধ দিয়ে কিছুক্ষণ বেহে ওকে বাড়ী এনে তুললেন। ওহুধ দিয়ে সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তুললেন।

বেহের মেয়ে

রোগের আক্রমণটা ইযমদ আকস্মিক, আরোগ্য লাভ করলেও তেমনি শিশুগির। এত ক্রত না হ'লেও কয়েক দিনের মধ্যেই রোগটা লেয়ে গেল। কিন্তু রোগের আক্রমণে যা হয় নি, রোগমুক্তির পর তাই হ'ল— পরীরটা কয়েক • দিনের মধ্যেই তেড়ে পড়ল। গছের কাটা-গাছের মত অবস্থা হ'ল। তীক্ষ্ণবার অস্ত্রের গয়ে শোনা যায়, গাছটাকে কেটে ছিল এক অস্ত্রবিদ্যুৎ দুলভি অস্ত্র দিয়ে। এমনই অস্ত্র যে গাছটা কেটে গেল, কিন্তু পড়ল না। ক্রমে স্বপ্ন শুকিয়ে গেল, তখন লোকে পরীক্ষা করতে যেতেই গাছটা প'ড়ে গেল আছাড় খেয়ে। রোগে জীর্ণ হয়েছিল বেহের অভ্যন্তর, রোগ তাগের পর সেই জীর্ণতা বেহের বাইরে আত্মপ্রকাশ করবে; শীর্ণ হয়ে গেল সে—কঙ্কালের মত শীর্ণ হয়ে গেল।

শুণের একটা মমতা জন্মে গিয়েছিল। যে-রোগীকে চিকিৎসক মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ছিনিয়ে আনেন, সে রোগীর উপর চিকিৎসকের একটা মমতা হয়; বোধ হয় শুভগ্রহের মত বাঁধা প'ড়ে দান চিকিৎসক। শুণ্ড ওকে লম্বা সারিয়ে তুলতে লাগলেন। সুপথ্য, বলকারক ওষুধ, কোন ব্যবহার ক্রটি করলেন না। বেহিয়ার বেহ প্রকৃতির সঙ্গে আত্মবিশ্বাস হুঁক ক'রে সে বেহের প্রতি কোবে কোবে উর্কর মৃত্তিকার অলপারণের শক্তির মত বল ও স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের একটা স্বাভাবিক শক্তি ছিল, তার সঙ্গে ওষুধ ও পথ্যের সাহায্য পেয়ে কিছু দিনের মধ্যেই পূর্বের চেয়েও ভাল স্বাস্থ্যে ত'রে উঠল তার বেহ, অধিকতর বলে বলীয়ান হয়ে উঠল সে। এবং বাঘাবর মানুষটি থেকে গেল এইখানেই। কিছু দিন পর নিজেই কোথা থেকে লংগ্রহ ক'রে আনলে এক লজ্জিনী। অনাথ ভিক্ষকের মেরে, রোগজীর্ণ, তাকে এনে এখানে বস বাঁধলে সে। শুণ্ড তাকে চাষের কাজ শিখিয়ে চাষে লাগালেন। সন্তানসন্ততি হ'ল। বংশধর-আটেক

বেয়ের বেয়ে

পর আবার এস এক বেয়ের দল। সেই বনের ছাঁট সংসারকে কোন
মতে তুলিয়ে আনি না, এখানে বাস করে' ছোট একটি গোষ্ঠী ম'কে
তুললে। বাস, তাই পরই আরম্ভ হ'ল—গ্রামের রক্তের থলী বল রক্তের
খেলা, অভ্যাগের ধর্ম বল তাই। চুরি আরম্ভ হ'ল।

সকলে গুপ্তকে ধারী করলে। গুপ্তকে মেনে নিতে হ'ল এ অপরাধ।
চন্দরের বাপকে ডেকে বললেন, তোর দ্বায়ে কি আমি বেশ ছাড়ব রে ?

কেন হজুর ? চন্দরের বাপ হাত জোড় করলে। আট-ন বছরের
মধ্যেই সে খাস বাড়ালী হয়ে গিয়েছে।

গুপ্ত বললেন, কেন ? তোরা চুরি ক'রে বেদের লোককে উত্যক্ত
ক'রে তুলি। 'আবার 'কেন' বলছিস ?

আপনার বাড়ীতে কখনও চুরি হবে না হজুর, আপনার বংশ বন্ত
দিন থাকবে, আমাদের বংশ বন্ত দিন থাকবে, ওত দিন আমাদের কেউ
তো করবেই না, অস্ত্র কোন দলকেও চুরি করতে হবে না।

গুপ্ত হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝতে পারলেন না। ওরে হতভাগী,
এর পর যে লোকে বলবে, সকলের বাড়ী চুরি হয়, ওর বাড়ীতে হয় না
বখন, তখন গুই আছে মূলে। আমাকে যে বেশ ছাড়তে হবে রে !

তার পর জেনে-জনে অনেক ধর্মের কাহিনীর অলম্ব্য করলেন।
চন্দরের বাপ বললে, আর হবে না বাবু। কান বলছি। তোমার
পারে হাত ধিরে বলছি

গুপ্ত পা ঝুঁতে দিলেন না। বললেন, থাক।

গ্রামের লোককে বললেন, দেখুন, অপরাধ আবার। কিন্তু
আপনারাও তো বাব বাস নি অপরাধ থেকে। আমি একটা রোগীকে
এনে বাড়ীতে রেখেছিলাম। পরে মনভাতে প'ড়ে বাস করবার আরণ্য

বেদের মেয়ে

দিয়েছি। আপনাদ্বা তাক্সা বেদিয়া বেধে বসন্ত করালেন। ‘একে উত্তম্বু হুয়ে পাঠি তিনে সোলমাল চারে হাট।’ ও বেটা একে কিছু করতে পারত না, আর হু-বরকে ও আনলে, আপনাদ্বা বললেন, সোলমাল আপনি লাবল। এখন শুভ চান তো তাদান ওদের এখন থেকে। আমি নিজে কিছু করতে পারব না, আল্লাহ দিয়ে তাদানো অর্থ; আপনাদ্বা তাদান, কিছু বলব না আমি।

ব’লেও কিছু শুণই বেবে বললেন, আচ্ছা, এবারের মত দেখুন।

বেধতে বেধতে একটা পুরুষই কেটে গেল। এর মধ্যে ওরা বার-কয়েক জেলেও গেল। সেইটাই হ’ল ওদের থাকবার আর এক জোরালো হাবি। জেল থেকে লোকটা না ফিরলে, যেহেতু বায় কি ক’রে? কোন্ ধর্ম জহুনায়েই বা তাদানো বায়। জেল-পাটাই হ’ল ওদের ধর্মের জোর, সেই জোরে ওরা থেকে গেল, এবং ব’লে গেল, ব’লে যাবার সময় এতোক থেকে গেল দু-তিনটি ছেলে এবং মেয়ে। তিন বার থেকে হয়ে গেল ন’ বার; তাতেও জোর বাড়ল এবং গিতপুরুষের ভিটের উপরেও একটা ধর্মের হাবি দাঁড়াল। ওরা থেকে গেল। ছুরি বাড়ল। ছড়িয়ে পড়ল। খানার লোকে ঘরলে, চালান বিলে, মাঝলা করলে, কখনও জেল হ’ল, কখনও খালান পেলে। এখন তাদাবার কথা উঠলেই ওরাও আইন বেধাতে শুরু করলে।

সেই কালের মেয়ে এই শিবি।

ওদের মেয়েগুলি পুরুষের মতই স্বতন্ত্র এবং বিচিত্রচরিত্র। রীতিও বিচিত্র। পুরুষেরা ধর্ম করে থাকে তখন ওরা হিংস্র এবং বক্ত, লামাত কথাতে নেকড়ের মত কাঁপিয়ে প’ড়ে আক্রমণ করে। যখন পুরুষেরা জেলে যায়, যেহেতু তখন পোষমানা হরিণীর মত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের

বেষের মেয়ে

পিছনে পিছনে বেড়ায়, করুণ মমির দৃষ্টিতে চোঁয় তাঁদের আকর্ষণ করে।

তিন পুরুষ হয়ে গেছে, বেষের বেষভূষা, রীতি ভাষা সব ভুলে গেছে। যে সব অখাপ্ত খেত, তার আশ্বাসন-ভুলে গেছে। কিন্তু এ ধারাটা আজও বার নি।

শিবি বেরিয়ানী ছিপছিপে পাতলা মেয়ে, মাথায় পাটো, বেষের অজপ্রত্যঙ্গ থেকে গড়নের রেখাগুলি মিহি এবং ধারাল, মাথায় প্রচুর চুল, চোখ ছোটো ছোটো কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে তার আশ্চর্য আকর্ষণ আছে।

চন্দরের বাপের চার ছেলে, তিন মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে চন্দরই সবচেয়ে ছোট। কিন্তু সে-ই এখন বেরিয়াদের মাতব্বর। চন্দরের মত চতুর, সাহসী, ক্ষুণ্ণগামী আর কেউ নাই। শিবির মা—চন্দরের ভায়ী ছিল রুপসী মেয়ে। চন্দরের হাতের একখানি স্বপ্ন। ওই স্বপ্নের সাহায্যে সে বহু উন্নত বন্ধন ছিন্ন করে নিশ্চিত বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। কারোনা চন্দরের প্রতি গোপনে মমতা করেছেন বাবুরা অনেক সাহায্য করেছে, বিএল, কেসের সাক্ষী তেঙেছে। কেসের বিচারক শিবির মাকে বেশে বিশ্বাস করেছেন যে এমন একটি মেয়েকে পনশাগী উচ্চবর্ণের ব্যক্তির পোশাক গ্রাস থেকে রক্ষা করতে গেলে তাঁদের বিরূপতা স্বাভাবিক, এবং পুলিশকে প্রত্যাশিত করে এমন বড়োদল্লক মামলা করানো এতটুকু আশ্চর্যের বিষয় নয়। বার বার অশ্রু ময়, বার দুয়েক এমন অবিবাস করেছেন বিচারকেরা।

শিবির বাপ কে, সে কথা কেউ জানে না। কিন্তু প্রশ্নও করে না। শিবি বড় হয়ে উঠল, বেষা বিল আপন পরিচয় নিয়ে। মমির দৃষ্টি এবং সীলাচকল বেহ, কঠো অলতরনের মত হাসি, এই তার পরিচয়। বেরিয়ার

বেথের মেয়ে

যরের মেয়ে, তার উপর চন্দ্রের তায়ী পুকুরী কত—এর চেয়ে আর
অধিক পরিচয়ের কি প্রয়োজন। শুণ্ডের পাড়ার সে বেত। বরস
যখন তার এগারো-বারো, তখন থেকেই তার বেহ নিয়ে খেলা শুরু
করেছিল তার মা। সব বে ছেনেছিল তখন থেকেই, কি আরও আগে
থেকে।

শুণ্ড-পাড়ার চতুর্থ গুলে রামায়ণ-গান হাঙ্কিল সেবার। শিবির মা
শিবিকে এবং আরও ক'জন মেয়েকে নিয়ে একটু নিরালা বেথে নিয়মিত
বেত গান শুনেত। গান শোনাটা অজুহাত, ওখানে সমাগত ভ্রমলোক-
দের নজরে আসাটাই ছিল মূল্য উদ্দেশ্য। এক দিকে উপার্জনটাও
ছিল না প্রধান কারণ, একটা অতুহ নেশার টানত। ভ্রমলোকদের
ছেলেদের কণিক প্রেরণী হওয়া-একটা। হুঁসিয়ার নেশা ওদের টানত।
নইলে এখন গ্রামে'জ হুটো রাইল-মিল হয়েছে, কুগি-মজুর অনেক, তাদের
উপার্জন বাবুদের ছেলেদের বাপ-মাদের পেওরা পয়সার চেয়ে অনেক
বেশী স্বচ্ছল, তাদের লাগসাও অনেক।

ওইখানে প্রথম শিবি বেথেছিল শুণ্ড মহাশয়ের ঘোঁহিব্রকে। বাপ
শহরে উকীল, ছেলে প্রভাত সেখানে পড়ে। যরেন পনেরো-বোল বছর,
গৌরবর্ণ, মাগুনমন ছেলেটি বন্ধরের একটা আশা গায়ে চটি পায়ে বিয়ে
যুয়ে বেড়াচ্ছিল।

শিবি বেথালে মাকে আতুল দিয়ে, বেথেছিল মা?

খুচকি ছেলে মা বললে, শুণ্ড মহাশয়ের নাতি।

কি জন্মের চেহারা দেবেছিল?

দেখেছি। দাঁড়া না, বেবছি।

কেউ প্রভাতকে ডেকেছিল এই সময়ে—প্রভাত!

বেকের বেয়ে

প্রভাত হুনে দাঁড়িয়ে উত্তর বিরহিল, আজ্ঞে । ৭

শিবি বলছিল, পেতামি ! নাশটিও-জারি লোকায় ।

বহরের নোক ওরা (বহে না) ! ওর হুনের নীচ, কি বললে দাঁড়া,
কেন নাশটি, মজু—হ্যা, বনে পড়েছে, মজুলিকা ।

প্রভাত এই সবরে বাইরে গিয়েছিল কি কাজে । শিবির বা শিবিরে
ঠেলা দিয়ে উঠিয়ে দিলে । ইশারা ক'রে ব'নে দিলে, বা ।

শিবি উঠে চ'লে গেল প্রভাতকে অনুসরণ ক'রে ।

প্রভাত দাঁড়িয়ে ছিল হুজু বাতালে । চক্কীমতলের অন্তর মবে পয়মে
হাঁপিয়ে উঠেছে । শিবি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল । প্রভাত লক্ষ্য
ক'রে একটু ল'রে গেল । তাবলে, কোন বেয়েছেলে বাইরে এনেছে
কোন এয়েজনে ।

বাহু !

প্রভাত গ্রাহ্য করলে না । অনুমানই করতে পারে নি সে যে,
যেয়েটি তাঁকেই ডাকছে ।

বাহু !—এসিয়ে এস শিবি ।

কে ? কি ?

একটা বিড়ি ধাও না বাহু ।

বিস্ময়ের অবধি রইল না প্রভাতের । বললে, কে তুমি ?

আমি শিবি ।

শিবি কে ?

ওই বেয়েগাড়ার আবার বাড়ি । ধাও না বাহু একটা বিড়ি ।

বিড়ি ? বিড়ি তো আমি খাই না ।

ও-না গ-অ । বেটাছেলে—কোয়ান ছেলে বিড়ি ধাও না ?

মেয়ে মেয়ে

প্রত্যন্ত এবার হঠাৎক ভয় পেলে। শব্দে থাকে, নতুন জাল
ছেলে,—ক্লাসে কান্ট হ'ল, শব্দার পর বাড়ির বাইরে যায় না। এবার
জায়ে নিশ্চয় রাতে একটা মেয়ে এইভাবে কথা বলতে পারে এতার
কন্ননার বাইরে নতুন হ'লে বুঝে বুঝে বাড়ির লোক করতে পারলে না।
তার ভয় হ'ল, পরীর কেমন কেঁপে উঠল। কোনও কথা সে বলতে
পারলে না।

মেয়েটা আরও একটু আগের এলে বললে, পরশা দাও না বাবু, তবু
কিনে আনি। চল, ওই ঘাটে ব'লে খেয়ে দেখবে।

প্রত্যন্ত এবার আর ছুটে চলে গেল চতীকণ্ঠের দিকের। শিবি
এটা করনা করতে পারে নি। পাড়ারগায়ের ছেলেরা এর চেয়ে অনেক
চালাক, অনেক শক্ত। আর সে বাড়াল না, ন'রে চলে গেল, অন্ধকারের
মধ্যে থানিকটা দূরেই হাক মেনের ভাড়া গোরা-বরের দিকে—জুতাই
চলে গেল। পাশ দিয়ে কি একটা সরসর ক'রে চলে গেল কোণের
মধ্যে। শিবি বললে, মরল। মরতে আর আরগা পাশ না জোঁরা।

একটু পরেই শিবি দেখলে, দুজন বেরিয়ে এল। হাতে আলো।
এক জন প্রত্যন্ত, অল্প জন প্রত্যন্তের দাদা।

কই—কোথায়?

এইখানে ছিল।

এর সঙ্গে তুই কী ছিল কেন? তোর বোবটা কোথায়? দেখুন
কি লাভা বিই ওকে।

শিবি অধাক হয়ে গেল। ও না। কি ধারার পুঁজু গো? এই
কথার কীবে? হি-হি-হি। শিবির লজ্জা হ'ল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস
ফেললে, ছাখ হ'ল তার। কেন হ'ল খড়িরে বেগলে না। কিন্তু মরটা

কেন্দ্রের

কেন্দ্র ভেঙে দেল। সে ভাঙা ঘরের পাশ দিয়ে গিয়ে একটা
পুকুরের ভিতরে নেমে পড়ল, বলের ধারে ধারে পাড়ের আড়াল রেখে
নিশেবে চলে গেল নিজেদের পাড়া। চন্দ্রকে বললে, তরা বোঝ
করতে আসবে লাগছে কতাবাঘ।

চন্দ্র বললে, আসবে আসবে। বলবি, বাবুই আমাকে ইশারা করে
ডেকেছিল।

না কতাবাঘ, ছেলেটা কেঁবে ভানিয়ে ঘেবে। নর গলার বড়ি-কড়ি
ঘেবে। আমি তোমার মাচানে উঠে বসে রইলাম। এলে ব'লো সে
তো সকাল থেকে ঘরে নাই। কুটুম-বাড়ী গিয়েছে।

চন্দ্র বললে, ওঃ। তোর যে দেখি একেবারে অথই হয়।

বোঝ হ'ল। চন্দ্র তিরস্কার শুনলে। শিবির মাও শুনলে। তারা
কিছু বাঁধ-প্রতিবাধ করলে না। বললে, এই পারে হাত দিয়ে বলছি,
শিবি সেই কাল সোমকাল থেকে ঘরে নাই। কুটুম-বাড়ী গিয়েছে।

.

তার অনেক দিন পর। বোধ হয় সাত-আট বছর পর। শিবি
তখন ভোলায় বকে লাঠা করেছে। ভোলা বাগী চোর। খেলখানার
আলাপ চন্দ্রের সঙ্গে। চন্দ্রের ছেলে হাংলার আঁপের বন্ধ হয়ে
উঠেছিল। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স। মুখে বলভের দাঁত, কিন্তু হুঁত
সোয়ান, আর তেমনি নিষ্ঠুর ও উজ্জ্বল। কেল থেকে ঘেরিয়ে সে

বেদের মেয়ে

একদিন ঐস এই বেহিরা পাড়ার হাবলের কাছে। শিবির গড়ে আলাপ হ'ল। মধ খাওয়ালে সে, গল্প করলে ডাকাতির। ভোলা চোর নয়, ভোলা ডাকাত। সাহনের কথায় সে বললে, সে কোন কিছুকে ভয় করে না। ভূত-প্রেত বা না-বতি পুলিশ দারোগা বাবু-মহাজন রাজা-মহারাজা কাউকে না।

পুলিস দারোগা বাবু মহাজন রাজা মহারাজা—এ নিয়ে কোন তর্ক উঠল না। উঠল ভূত-প্রেত নিয়ে। মহাবল বললে, কত বড় মরদ, কই বাও গিরে আমাদের লালুকচাঁদা পুকুরের পাড়ের বটগাছের “নিষড়গালে” বেঁধে রেখে এস বেঁধি একখানা লাগ শ্রাকড়া। বেঁধি কেমন মরদ।

চন্দর বললে, এই বেথ, ও সব তর্কে কাজ কি রে বাবা? ও মধ ছাড়ান বে।

ভোলা কানেই তুললে না, বললে, বাজি রইল পাঁচ টাকা নগদ—খাসির দাম আর পাকি মধ বেবে তোমরা বল?

শিবি ব'লে উঠল, আমি ঘোবো। এই রইল আমার কানের ফুল, হাতের আঙুটি। কাল—কাল তা হ'লে বাবে। ঠিক রাত-দুপুরে। দিনে দেখে আসবে গাছ।

গাছ আমি দেখেছি। আজই অগুনি উঠছি আমি। বাও লাগ গাছ।

হাবল বললে, যাক্ তাই বন্ধ। ও সব বাঁঝা তত্তে কাজ কি। আমি হার মানছি।

চন্দরও বললে, ভোলানাথ, বুড়ো মানুষের কথা শুনতে হয়।

ভোলা ছাড়লে না। সে বললে, বাও মধ হ পাভ্য—বাও।

শিবি হঠাৎ দারের কাছে উঠে গেল।

বেদের মেয়ে

ভোলা মস্ত পান ক'রে উঠে বললে, চললাম তা হ'লে। কই হে, কোথায় গেলে? চারিদিক তাকিয়ে সে শিবিকে খুঁজলে।

শিবির মা বললে, গুল। বলছে—গা ঘুরছে।

ভোলা চ'লে গেল গ্রাম পার হ'য়ে। নিজের প্রাঙ্করে একটা অলহীন পুকুর, চারিদিকে বাশ কয়লা হেঁড়া কাঁথা বাগিশ ছড়ানো, তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে এক প্রাচীন বট, শাখায় পল্লবে এমন ঘন যে দিনেও তলায় অ'মে থাকে ছায়ার চেয়েও গাঢ় কিছু,—অন্ধকারই তাকে বলতে হয়। রাত্রে ভীমকার গাছটাকে দূর থেকে দেখে মনে হয়, আকাশের গায়ে ঘন কালো কালবৈশাখীর মেঘের একটা পুঞ্জ থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ভোলা এগিয়ে এল। থমকে দাঁড়াল। বৃকটা ধড়াস ক'রে উঠল। গাছটার একটা ডাল ছলছে। ডালটার উপর একটা শাখা মুর্তি। একটা ডালে পা রেখে উপরের ডালটা ধ'রে নাড়ছে।

ভোলা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হা-হা ক'রে হেসে উঠে পাছের ডালটা ধ'রে দোল খেয়ে উঠে প'ড়ে পাকড়াও করলে শিবিকে।

সেই গাছের ডালে ব'লেই ওদের প্রথম অণয়লাপ হ'ল, ঘনিষ্ঠ হ'ল পরস্পর।

পরের দিন ভোলা জাত দিয়ে হ'ল বাড়িয়া। বিয়ে করলে শিবিকে।

ভোলা যখন ঘরে থাকে শিবি তখন ব্যাঙ্গী। যখন সে জেলে যায়, তখন সে বৈরিনী। কিন্তু ভোলা তখন জেলের বাইরে—বরেই ছিল। ওদের বিয়ের লাভ বছর পরের কথা।

গায়ে তখন বড় টেশন হয়েছে। ভোলা ঘর বেঁধেছে টেশনের

বেদের মেয়ে

পথের ধারে। শিবি উঠানে ব'লে পশ্চিমের রোজে চুল এলো ক'রে
বিরে শুকছিল। প্রভাতের সঙ্গে আবার শিবির বেধা হ'ল।

প্রভাত স্টেশনে নেবে ব্যাগটা কুলির মাথার বিরে বাচ্ছিল মাথার
বাড়ি।

শিবি শবিরে উঠে দাঁড়াল উঠানে।

গৌরবর্ণ লম্বা তরুণ ছোয়ান, চোখে চশমা, পরনে ধপধপে খদ্দের
পাঞ্জাবি, খদ্দেরের কাপড়, পায়ে কাবলী শ্রাণ্ডল। এমন সুন্দর চেহারার
বাবু তো এ গাঁয়ে নাই! কে? চেনা-চেনাও মনে হচ্ছে বেন! স্থির
দৃষ্টি রেখে সে এসে পথের উপর দাঁড়াল।

চিনতে পারলে। ঠিক চিনলে। বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে
উঠল। সে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবেন গো বাবু?

প্রভাত জরুজ্বিত ক'রে ওর দিকে তাকালে। পথের ধারে একটা
মেয়ে এমন ক'রে 'কোথায় যাবে' জিজ্ঞাসা করে, এটা তার কাছে ভাল
লাগল না। ষাড় বৈকিরে তাচ্ছিল্যপূর্ণ বক্ষিম দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে
আপারমত্তক দেখে ঘুরে দাঁড়াল সোজা হয়ে। বুদ্ধিতে তার মনে পড়ে
গেল সাত বছর আগের একটি অগল্ভা মেয়ের কথা। চিনে ফেললে
প্রভাত। এ তো সেই বেবের মেয়ে। বয়সের শুণেখানিকটা পরিবর্তন
হয়েছে। রূপটা উজ্জ্বল হয়েছে, মদ্রির হয়েছে, মাথার বানিকটা লম্বা
হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ। তুই তো বেবের মেয়েটা?

শিবি হেসে বললে, হ্যাঁ গো, সেই মেয়েটা। চিনেছেন তা
হ'লে। দাঁড়ান, পেণাম করি।

না। স'রে দাঁড়াল প্রভাত। স্রণাতরেই বললে, এখনও সেই
রকম আছিল তুই?

বেদের মেয়ে

চ'লে গেল সে।

শিবির চোখে আজ সে ছেলেবেলার নেশা নাই। আজ সে ভীক-বাস্তব বুদ্ধিমত্তী ছলনাময়ী। সে আজকাল বাবুপাড়া দ্বিগে হাটেই না। হাটে সে বাজারের পথে, স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে, স্ট্রেনে, হাটে সে রাইস-মিলের কাছাকাছি! বাবুদের ছেলেদের নামে খেলা জ'য়ে গেছে। ওরা জানে শুধু ব্যভিচার করতে, ভালবাসা ওদের নাই, ভোলায় মত জাত দিতে ওরা পারে না। নিতান্ত অভাবে দেহের কারবার ক'রে খেতে হয়, প্রয়োজন অর্থের। সে অর্থ বাবু রাইস-মিলের কুলিদের মত কি বাজারে দোকানীদের ছোকরাদের মত দিতে পারে না। তখন ওদের দিকে তাকাবে কেন? ওরা বড় সাবু সায়ে। আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে খেলা খেলে কাল তোমার দেখেও ক'লে থাকবে গভীর হয়ে, যদি তোমার বুকের ভিতরের হাসির মধু উপচে এসে ঠোটে ছড়িয়ে পড়ে, তবে সে হাসির মধুকে মদ ব'লে খেলা ক'রে শাসন ক'রে বলবে, নচ্ছার, এখানে এসেছে মদ বেচতে, এই ঠাকুর-বাড়ির উঠানে! তাই শিবির খেলা জ'য়েছে, তাই শিবি ওদের নামে খুতু ক'লে। কি ক'রে জানবি ভোলা শিবির কথা, বেদের মেয়ের কথা! তোদের বাইরের খোসাটা দিয়ে খেলা করে, তার বুকের ভিতরের মাহুত বুকের ভিতরে আছে, থাকে। এই কথা তোদের বুকের মাহুতও জানে। যেটা একদিন গুড়ে বাবে, প'চে বাবে, প'ড়ে থাকবে, সে জিনিসের আবার 'ছুত-পবিত'! তাই তারাও এতে আপত্তি করে না।

আজ কিন্তু শিবি পথের উপর চূপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষন।

মা ডাকলে, দাঁড়িয়ে কেন লো?

বেদের মেয়ে

শিবি ফিরে এসে বললে, মা, সেই পেভাতবাহু এলোছে, সেই গুপ্ত-বাড়ির মেয়ের ছাওয়াল! সেই যে গো—কঁধে ফেলেছিল!

মা বললে, মরণ! এখনও নেশা আছে না কি?

লজ্জা পেলেন শিবি। বললে, না। তারপর খিলখিল ক'রে হেসে বললে, এখন খুব জোরান হরেচে গো! আমি কথা বললাম, তা এবার আর কাঁধলে না।

কাঁচের ঢাকার মধ্যে হুলুত কুল ঢেকে রাখে। তার চারিপাশে ঘুরে বেড়ায় নীল মাছি।

ভেতমি ভাবে শিবি এবার ঘুরতে লাগল গুপ্তপাড়ার।

চকিত হয়ে উঠল লোকে। নীল মাছি—নর্দমায় উৎপত্তি, সংক্রামক ব্যাধির বোজাণু নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলে লোকে লাভধান হয়, চকিত হয়।

লোকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওব দিকে তাকিয়ে ক্র-কুঞ্চিত করলে। গ্রাস্ত করলে না শিবি। তারপরও ঘুরতে দেখে ওকে লোকে লাভধান ক'রে দিলে—এ পাড়ায় কেন?

আমার খুশি। পাড়ায় পথে ঘুরি, কারুর ঘরে ঢুকি না, লরকারি পথ, ইউনান বোডের ট্যাক্স দি, একশো বার ইন্টব।

প্রভাত যে ঘরে থাকে, তার পিছনে পুরানো বাগান। সেই বাগানে গিরে ব'লে গান গাইতে শুরু করলে। প্রভাত জামলাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

রুখে পিচ কেটে উঠে চ'লে এল শিবি। বললে, মরণ আমার!

প্রভাত আবার একদিন চ'লে গেল। শিবি ওপাড়ার ইন্টব ছেড়ে দিলে।

বেদের মেয়ে

আয়ত্ত বছর করেক পর।

ভোলা এবার জেলে গিয়েছে। ডাকাতির মাফল্য বেড়াই হয়েছে পাঁচ বছর। বৈরিণী শিবির বয়স বেড়েছে, কিন্তু বেদের মেয়ের মুখে তার ছাপ পড়ে নি। ঠিক যেন সেই শিবিই আছে, শুধু পাতলা হেঁহানা ঈষৎ ভারী হয়েছে। শিবি জানে তাতে তার আকর্ষণ বেড়েছে। লাজলজ্জার চঙাও পালটেছে সে। বুকের মানুষকে বুকে রেখে—দেহ নিয়ে সে বশাতি করে।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ এল গোসাইজী। লিক্লিকে পাতলা গোসাইজী শিবির চেয়েও ভ্রষ্ট চরিত্র। পুলিশের গুপ্তচর। সাবধান হ'ল শিবি।

গোসাই বললে, ডাকবাংলায় চল।

কেন গো? সেখানে কেন? মরণ আমার!

নিস্পেক্তর এসেছে। টাকা দেবে।

শিবির আপত্তি নাই। ডাকাতের পরিবার সে, কিন্তু পুলিশের হোসরা-চোমরা এসে তাকে নিয়ে আমোদ করে। সচরাচর করে না। খবর দিবে এলে তখন অস্ত্র বন্দোবস্ত হয়ে থাকে। গরীব সংজাতের খারাপ-চরিত্রের বেয়েদের আনে। তার অস্ত্র লোক আছে। হঠাৎ এসে পড়লেই তাকে ডাক পড়ে। আসে গোসাইজী। শিবি হাত পেতে বললে, টাকা আগাম দাও।

দুটো টাকা। আগে ছিল এক টাকা। বুকের বাজারে এক টাকা ছ'টাকা হয়েছে। টাকা ধরে রেখে কাপড় পালটে শিবি বললে, চল।

গোসাই রসিকতা ক'রে বললে, হেঁটে নয়, চল মটর এনেছি।

শিবি বললে, মটরের চেয়ে তোমার কাঁধ ভাল। চল না কাঁধে ক'রে নিয়ে।

বেদের মেয়ে

শিবি কিরিল গভীর রাত্রে ।

মোটর থেকে নেমে ধরে ঢুকল ।

মা বললে, এলি ?

হঁ ।

শুয়ে পড় ।

হঁ ।

হঁ কি ? শুয়ে পড় ।

শিবি দরজার কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল । মা উঠে বলল, শিবি !

চুপ । তারপর দরজা খুলে দাঁড়ায় বেরিয়ে দাঁড়াল । কিছুক্ষণ চারিদিকে দেখে একখানা কালো কাপড় টেনে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে বললে, আসছি । চুপ ক'রে শুয়ে থাক ।

শিবির মা—চন্দন বেদের ভাগ্নি এর পর আর প্রসন্ন করলে না ।

শিবি আপত্তি ভেঙে, জঙ্গলে জঙ্গলে এসে উঠল গুপ্ত-বাড়ির পিছনের বাগানে ।

ছোট্ট ঢেলা নিয়ে জানলার ঝরতে লাগল, টুক-টুক-টুক-টুক ।

অল্প একটু খুলল জানলাটা ।

শিবি বললে, পেছাতবাবু হও তো শোন । তোমার ঘোঁজে পুলিশ এসেছে । তুমি নাকি ফেরার, শেবে-রাত্রে পাড়া ঘেরাও করবে । মটর-বোঝাই পুলিশ এসেছে বন্দুক নিয়ে, আমি যেখে এসেছি । রাত তিনটে বাজবে আর পুলিশ ব'লে বাথে চারি দিকে ।

জানলাটা খুলে গেল । ঐ ভাত বললে, কে তুমি ?

আমি বেদের মেয়ে, শিবি বাড়িয়ানি ।

জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল । শিবি দাঁড়িয়ে রইল । মিনিট করেক

বেদের মেয়ে

পরেই বেরিয়ে এল প্রভাত। কাঁধে তার একটা বড়-ঝোলা। অন্ধকারে ভাল দেখিতে পেল না শিবি, তবু মনে হ'ল, প্রভাতবাবু আরও যেন ধারাল হয়েছে ইম্পাতের ছোরার মত, অন্ধকারের মধ্যেও পালিশ যেন চকচক করছে।

শিবির হাতখানা চেপে ধরলে প্রভাত। একসঙ্গে চম্কে এবং শিউরে উঠল শিবি। পর-মুহূর্তেই ভুল ভাঙল। হাতের মুঠি প্রভাত-বাবুর যেন লোহার সাঁড়ান্ধী। চাপা গলায় সাপের মত গজ'ন ক'রে প্রভাত বললে, কি ক'রে জানলি তুই ?

জানলাম বাবু, আমার ডেকেছিল ডাক-বাংলায়।

ডাক-বাংলায় ? কে ? কেন ?

বেদের মেয়েকে ডাক-বাংলায়, থানায় ডাকে বাবু। সরকারী বাবুরা চু-চার জন ডাকে। তারা তোমার মত গঙ্গাজল খায় না বাবু। আমি মিছে বলি নাই। তুমি পালাও।

মিথ্যা বলে নাই, সে প্রভাত জানে।

হনহন ক'রে এগিয়ে চলল সে। কিছু দূর গিয়েই তাকে দাঁড়াতে হ'ল। মোটর গরির গজ'ন উঠে গেছে গ্রামের পথে। শিবি বললে, আমার সঙ্গে এস।

ভোর সঙ্গে ?

হ্যাঁ। এস।

উপায় নাই। শিবির গিছনেই চলল প্রভাত।

গরির গজ'ন এগিয়ে এল। ধামল। একটা বাঁশী বাজল, হুইসিল।

শিবি বললে, আমার ঘরে ঢোক।

ধমকে দাঁড়াল প্রভাত।

বেদের মেয়ে

তরুণীপথ। অনেকগুলো ভারী জুতো একসঙ্গে পড়ছে, তার শব্দ
উঠছে ভৌতিক শব্দের মত। ঘুলায় ভরা গ্রামের পথ। মস্-মস্-মস্-মস্।
শিবির মা বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় গুল।

• • • • •

মস্-মস্-মস্-মস্। শব্দ উঠছে। এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে,
এদিক থেকে হুইসল বাজছে, ওদিক থেকে সাড়া আগছে হুইসলেই।

মা মৃদুস্বরে বাইরে থেকে কানলে।

শিবি বললে, চুপ ক'রে বিছানার শুয়ে পড়।

বিছানার ?

হ্যাঁ।

জুতোর শব্দ দূরে চ'লে গেল।

শিবি হেসে বললে, ওরা যদি আসে ? যদি বেখে থাকে ? তুমি
শুয়ে পড়, ভেতী লাগিয়ে তোমাকে উড়িয়ে দি। ওরা বেখেতে পাবে
না, খুঁজে পাবে না।

সর্বনাশী বেদের মেয়ের এ সময়েও হাসি, এ সময়েও বিচিত্র
রসিকতা ! অতি মৃদুস্বরে সে গান ধ'রে দিলে—

বাবু তোমার দেখাই দেবো,

কাঁউরের ভেতী বাজী,

বেদের মেয়ের ভেতী খেলা—

তোমারে দেখাই বেখো ;

তুমি শুধু চেয়ে থাকো

বেদের মেয়ের সুখের দিকে—

বেঘের বেঘে

চোখে চোখ মিলিয়ে রেখে

তুমি শুধু চেয়ে থাকো

দেখাই দেখো!

নিজে তুমি সামনে থেকে

তোমাকে হারিয়ে দোব, উড়িয়ে দোব

আকাশে উড়িয়ে দোব—

নিজেকে সামাল রেখো—

চেয়ে থাকো।

প্রভাত সত্যই যেন নেশায় অভিভূত হয়ে পড়ছিল।

শিবি অতি ক্লীণ হিল্লোলে দেহ লীলায়িত ক'রে নাচছে। স্থির
হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেহখানি শুধু ঐ কৈবৈকে জ্বলছে।

শিবি সর্বনাশী! প্রভাতের শিররে সর্বনাশ। আর সে গান গাইছে—

এবারে কাজল পরো—

আমার চোখের কাজল নিয়ে

তোমার চোখে কাজল দিয়ে

তাকিয়ে দেখ দেখি, ফুটল নাকি—

দেখ তো ফুটল নাকি

আকাশের তারাগুলান

হুই আকাশের তারাগুলান

ফুল হয়ে ফুটল নাকি—

দেখ দেখি!

সংঘত ক'রে কেললে প্রভাত নিজেকে। অগ্রসর হ'ল সে দরজার দিকে।

বাবু!

বেকের মেয়ে

না।

বেরিরো না বাবু।

না।

না। এখান্নেওঁ ধরবে—বাইরেও ধরতে পারবে না। তুমি শুয়ে পড়, আমি তোমাকে ঢেকে শুয়ে পড়ব, সেপ ঢাকা দোব। মাথার চুল কেলে দোব বালিশের ওপর। মা বলবে, ডাক-বাংলা থেকে কিরে আবার কম্প দিয়ে অর এসেছে।

সমস্ত শরীর প্রভাতের বেন স্থগার শিউরে লুচুচিত হয়ে গেল। সে মুহূর্তে ঘরের দরজা খুলে বেরিরে পড়ল।

বাবু! বাবু!—ছুটে বাইরে এল শিবি। দেখলে, প্রভাত মিলিরে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

কয়েক মিনিট পরেই গুলির শব্দ উঠিল। কট-কট।

গোলমাল উঠল প্রচণ্ড।

তার কয়েক মিনিট পরেই আহত প্রভাতকে ব'রে নিয়ে রাত্তা ঘিরে চ'লে গেল পুলিশের লেপাইয়ের দল। ১৯৪২ সাল।

* * *

তারও কয়েক বছর পর।

প্রভাতের গুলি লেগেছিল পায়ে। জাহুর মাংস তেব ক'রে চ'লে গিয়েছিল। সেরে গুটার পর হয়েছিল জেল। এবার প্রাণণ মাসে নাকি বেশ থেকে লারেবকের রাজস্ব গেল। রাজস্ব নাকি এখন খবেরী-বাবুদের। শিবি মধ্যে মধ্যে তাবে, প্রভাতবাবু তবে কোথায়? তাকে রাজবেশে দেখতে তার লাব হয়।

বেদের মেয়ে

ভোলা জেল থেকে খালাস পেয়েছে। ওই জন্তেই পেয়েছে।
নইলে মেয়াদের আরও বছরখানেক বাকি ছিল।

আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল শিবির প্রভাতবাবুর সঙ্গে। এমন ভাবে
দেখা হবে, তা কে জানত! হাজতের মধ্যে অক্ষকার। বাইরে
অমাবস্তা। কালীপূজোর দিন। শিবি একা হাজতের কোণে ব'লে
কাঁদতে লাগল ঝুপিয়ে ঝুপিয়ে।

টকটকে রক্ত তার লবালে এখনও লেগে রয়েছে।

কিনিকি দিয়ে প্রভাতের রক্ত তার মুখে এসে লেগেছিল।

কালীপূজোর রাত্রে ভোলা ডাকাতি করতে গিয়েছিল। এই গায়েরই।
গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে হয়েছে নতুন হাঁসপাতাল। হাঁসপাতাল, আর
ডাক্তারের বাসা ছাড়া কাছে পিঠে বাড়ি-ঘর নাই। সে দিন ভোলা নিজে
কানে শুনে এসেছিল, কালীপূজোর রাত্রে ডাক্তার বাবে মহেশপুরে
দশ-হাত উঁচু কালীর পূজো দেখতে। সেখানকার বাবুৱা নিমন্ত্রণ ক'রে
গিয়েছে। তারাই পাঠাবে গাড়ি। ডাক্তারের বাড়িতে থাকবে শুধু
একটা চাকর। ডাক্তার প্রচুর রোজগার করে। ডাক্তারের বাড়ির
মেরেছেলের গারে অনেক গরনা। ভোলা এ স্ত্রীযোগ ছাড়লে না।
শিবি খুঁশি হ'ল। ডাক্তারের বউয়ের গলার হারটা সে গলার পরবে।
ওটা সে রাখবে। দিনে পরা চলবে না রাত্রে প'রে শুয়ে থাকবে।
আলো জেলে আয়নায় দেখবে, তাকে কেমন মানায়।

মহেশপুরে বাবার পথ, এই স্টেশনের পথ। বাবুদের গাড়ি এল।
চ'লে গেল হাঁসপাতালের বিকে, আবার থুরে চ'লে গেল মহেশপুরের
বিকে। ভোলায় বেরিয়ে পড়ল। শিবি দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির সামনের
গাছতলার নীচে। মাথায় উপরে গাছটার কোন কোটরে লাগে বোধ

বেঘের মেয়ে

হয় পাখির বাচ্চা ধরেছে। চোঁচাচ্ছে বাচ্চাটা, কাতরে কাতরে চোঁচাচ্ছে।
পাখির মা-টা তার স্বরে চোঁচাচ্ছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে।

হঠাৎ উঠল বন্দুকের শব্দ।

চমকে উঠলু শিবি। বন্দুক! একটা, দুটো—আবার—। এবার
একটা দুটো তিনটে চারটে পাচটা—! মা ডাকলে, শিবি!

ইয়া।

কি হ'ল, বল দেখি?

বুঝতে পারছি না।

ওর বুক ধড়ফড় করছে, কিন্তু চোখ ধকধক ক'রে অলছে।

বাড়ি আয়।

না।—এগিয়ে চলল সে।

ছুটে কেউ আসছে।—কে? ভোলা?

হাঁপাতে হাঁপাতে ভোলা বললে, আমি।

কি হ'ল?

বন্দুক। গুলি চালালে। কে একজন ডাক্তারের বাগায় এসেছে।
জানতাম না। ডাক্তার যায় নাই। সেই লোকটা ডাক্তারের বন্দুক
নিরে দাঁড়িয়ে গুলি চালালে। চল, বাড়ি চল। পায়ে ছিটে লেগেছে।
বেশি লাগে নাই, রক্ত ঝরছে খানিক খানিক।

তু পালা। বলব—বাড়ি নাই, কুটুন-বাড়ি গিরেছিল।

অল। অল থাব এক বাড়ি। সর্বশরীর কাঁপছে।

অল খেতে স্বরে চুকেছে। উঠানে ছটা বেজে উঠল জোরালো টর্কের।

শিবি ধরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

বেদের মেয়ে

উঠানে অনেকগুলো ছুতোর শব্দ ।

ভোলা কই ?

সে তো বাড়ি নেই বাবা ।

কোথায় ?

ছুটুম-বাড়ি গিয়েছে সকালে ।

দরজা খোল্ । দর দেখব ।

বরে শিবি শুয়ে আছে বাবা । তার হেলে কঁপে অর এসেছে
তিনখানা কাঁথা দিয়ে কাঁপন থামে না ।

খোল্ না তুই দরজা ।

ভেতর থেকে বন্ধ আছে । শিবির অর, কে খুলবে ?

প্রচণ্ড লাগি পড়ল দরজার । একটা ছুটো তিনটে । খিলটা
ছেড়ে গেল ।

দরখানা টর্চের আলোর তরে উঠল । মেঝের উপর বাহিরাদের
বিছানার কাঁথা চাপিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা মেয়ে ।
বালিশের উপরে চুলের রাশ এলিয়ে মেঝের উপর পড়ে ঘুলোর
লুটোচ্ছে । নিথর, বোধ হয় চেতনা নাই । দারোগা টর্চটা ছবার
তিনবার কেললেন ।

ওইখানেই আছে দারোগাবাবু ।

কোথায় ? ও তো লেই মেয়েটা । ওই দাঙ্গির লেই মেয়েটা,
অর হয়েছে ।

না । আনি জানি ।

চমকে উঠল শিবি । বিছানার ভিতর থাকে একটা ছুরি । সে
চেপে ধরলে ।

বেকের মেয়ে

কাঁধাটা টেনে কেলে দিচ্ছে।

ভোলা, আমি মারব ছুরি। তুই পালাবি।

ডালা-খোলা কাঁপির ভিতরের সাপের কণা তুলে ছোবল মারার
মত শিবি লাফিয়ে উঠে কাঁপিয়ে পড়ল, ছোবল মারার মত ছুরিখানা
বলিয়ে দিলে।

হারোগা হা-হা ক'রে ছুটে এল।

ভোলা ছুটে পালাল খোলা বরজা দিয়ে।

নিষ্ঠুর মুঠোতে চেপে ধরেছে শিবির হাত। বনমন করছে, খঁলে
যাচ্ছে।

প্রভাতবাবু!

হ্যাঁ।

খুব লেগেছে? কোথায় লেগেছে?

আর স্তনতে পায় নি শিবি। সে যেন কালা হয়ে গেল।
আলোরয় হয়ে উঠেছে বরটা। প্রভাতবাবুই তো!

এলিয়ে প'ড়ে গেল সে। ছুরি যেন সে নিজের বৃকেই মেয়েছে।

হাঅতে ব'সে ঝুঁপিয়ে ঝুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

ঠোঁটের উপর এখনও লেগে রয়েছে প্রভাতবাবুর রক্ত।

রক্ত লোনা। চোখের জল, তাও লোনা।

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

সকল আলো যেন অকস্মাৎ এক মুহূর্তে নিবে গেল। আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত যেন নিরঙ্কর অন্ধকারে ঢেকে গেল। শুক হরে গেল সকল শব্দ, শুধু অবাক্ত বেদনায় একটা মর্ষভেদী কম্পন ব'য়ে গেল বায়ুস্তরে ; পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কম্পিত বায়ুস্তর সংবাদ ছড়িয়ে দিলে—মহাত্মা গান্ধী হত হয়েছেন। পিতৃলের গুলিতে আহত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মহাত্মাজী আর নাই।

৩০শে জানুয়ারী, সন্ধ্যার প্রাকাল। অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও থেকে কয়েক মুহূর্তের আকস্মিক শুকতার পর গভীর শোকাহত অথচ সংবত কর্তে ঘোষণা ধ্বনিত হয়ে উঠল—মহাত্মাজী আর নাই।

মুহূর্তে আমার মনে হ'ল, সকল আলো যেন অকস্মাৎ এক মুহূর্তে নিবে গেছে। আর কোন শব্দ শুনে পেলাম না। মনে হ'ল সকল শব্দ যেন শুক হরে গেছে। আর মনে হ'ল বায়ুস্তরে, একটা কম্পনের স্পর্শ পাচ্ছি। বায়ুস্তর যেন কাঁপছে।

ক্রমপথে পথ অভিক্রম ক'রে চলেছিলাম। চারিপাশে শুভিত জনতা সিনেমা-হল থেকে বর্ণকেরা বেরিয়ে আগছে, ঘোঁকান বন্ধ হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে রেডিও থেকে হু-এক মিনিট শুকতার পর নিরবিতভাবে প্রচারিত হচ্ছে—মহাত্মা গান্ধী পিতৃলের গুলিতে আহত হয়ে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

যথো যথো জনতার মধ্য থেকে জুড় প্রের জনিত হয়ে উঠছে—কে ?
কে সে ?

আবার বনেও জনিত হয়ে উঠল জুড় প্রেরের প্রতিধ্বনি—কে ?
কে ? কে সে হত্যাকারী ? জুড় গর্জনে চীৎকার করতে ইচ্ছা হ'ল, কে
হত্যাকারী ? কি তার নাম, কি তার পরিচয়, কোন্ সম্ভাব্যভূক্ত সে ?

আবার বেন সমগ্র বায়ুমণ্ডলে একটা কম্পনের স্পর্শ অনুভব করলাম,
উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডলে বেন থরথর ক'রে কম্পন ব'রে বাচ্ছে ; জুড় তার প্রবেশের
মাহুতের মনের স্পর্শে বায়ুমণ্ডলে বহির্জালা সঞ্চারিত হয়েছে, একটি মাত্র
প্রশ্নের আঘাতে থরথর ক'রে কাঁপছে—কে সে হত্যাকারী ? কি তার
নাম ? কোন্ সম্ভাব্যভূক্ত সে ?

* * *

বাড়ীর বোরে থবরের কাগজের আগুন। বিপুল জনতা জমে
আছে সেখানে। স্পেশাল বের হবে। হকারেরা খুঁজে পড়েছে
কোলাপ্‌সিবি'ল্‌ গেষ্টের উপর। গেট বন্ধ। ভিতরে জটপতিতে চলছে
রোটারি ব্লক। জনতার মধ্য দিয়ে কোন রকমে পথ ক'রে বাড়ি এসে
পৌঁছুলাম। পিছনে জনতার কোলাহল জনিত হচ্ছে। সিঁড়িতে
উঠতেই অজ্ঞ একটি বিপরীত দিকের কানে এসে পৌঁছল। বেগুলালের
আবরণের মধ্যে বাড়িখানা শুক, সেই শুক পরিবেশনের মধ্যে লকলপ
বৈরাগ্যে মর্মস্পর্শী হয়ে গটন বাজছে, “সম্মুখে শক্তি পাহারার ভাঙা
তরুণী হে কর্ণধার।” অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, সেখানে। বাড়ীর
দীর্ঘনিশ্বাস আগুন ক'রে পড়ল যুক থেকে, চোখ থেকে সিঁড়ির এসে রক্ত
আবরণ ধারী।

বরষা-প্রবাহ উপাখ্যান

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা শুক্ক বিবধ। কষ্ট হয়ে গেছে বুক, ঘন হয়ে গেছে বিহ্বল, মস্তিষ্ক অতিভূত। পরস্পরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বসে আছে।

তাদের মধ্যেও বসে থাকতে পারলাম না। তেতলার ছাদের উপর ছোট কুঠুরিটিতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে আশে নিবিয়ে দিলাম। ইচ্ছা হ'ল, চীৎকার ক'রে কাঁদি। চীৎকার ক'রে কেঁদে ডাকি—ডাকি মহাত্মাজীর আত্মাকে; জীবনের শেষমুহূর্তটি পৰ্ব্বত কর্ণের পতাকা, ধর্মের পতাকা বহন ক'রে আত্মত্যাগীর আক্রমণকে বৃকে মিরে সকল কর্ম শেষ ক'রে যে আত্মা চলেছে অমৃতলোকের উদ্দেশে, সেই আত্মাকে ডাকি—কিরে 'এস হে পিতা, হে মহাত্মা, হে শান্ত, হে শুভ, হে অনন্তপুণ্যের ঐতীক, তুমি জিতেন্দ্রিয়, তুমি দ্বিতনিত্র, জিতাহার, তুমি অপরাধিতা-মন্ত্রের ভগবতী, তোমার পরাজয় নাই, তোমার মৃত্যু নাই, তুমি তো জিতমৃত্যু, হতে পারে না তোমার মৃত্যু, তুমি কিরে এস—তুমি কিরে এস—তুমি কিরে এস।

কিন্তু কণ্ঠস্বর বেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। চীৎকার করতে পারলাম না। টেবিলের উপর মাথা রেখে বসে রইলাম।

রেডিওতে করুণ সুরে বেহালা বাজছে। আমার অন্তরে বেন তার প্রতিধ্বনি উঠছে। শুধু আমার অন্তরেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের অন্তরেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, বেবেই চলেছে—বেবেই চলেছে—বেবেই চলেছে। মনে হ'ল, আকাশ থেকে পৃথিবী পৰ্ব্বত স্রুস্ত বায়ুস্তর, জীব-মানস, বস্ত্রভগ্নতের সকল অণু-পরমাণুতে প্রতিধ্বনি তুলে সে সঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, এক অতৃপ্তপূর্ব অম্লভূতি অহুতবী করলাম, প্পট বুবতে পারলাম, এ তো রেডিওর স্বরসঙ্গীত নয়,

কোর পার্থিব বস্ত্রে এমন ছত্র বাজে না, এ সঙ্গীতও বেবনার গান নয়, এ শুধু করুণা। শান্ত বিদ্ধ লোকটার অপকল্প সঙ্গীত। বুঝতে পারলাম, আমার সব উপলব্ধি অল্পকৃতিই আমাকে বলে দিলে, সকল সৃষ্টিই অন্তরলোকের এই সঙ্গীত অনাভূত কাল অনাহতভাবে বেজে চলেছে, এ সেই জীবন-সঙ্গীত। সৃষ্টি এবং কর, জ্ঞান এবং সৃষ্টির মধ্যে অমৃত বিরে সেতুবন্ধন রচনার অপকল্প পরিকল্পনা-সঙ্গীত।

অকস্মাৎ বাতানের বটকার খুলে গেল একটা জানালা। বাতানের ঝলকের সঙ্গে জনতার কোলাহল এসে কানে পৌঁছল; চকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম; সে জীত আর গুনতে পাচ্ছি না, কোলাহলে যেন তাকে ঢেকে দিয়েছে, এটি ক'রে নিরেছে রাক্ষসের মত। জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

ধর্মের কাগজের আগিদের নামনে ক্রুদ্ধ জনতা প্রশ্ন করছে, কে সে? কে? হিন্দু তো। বুঝলাম, কিন্তু কে সে? কি নাম? কোন্ দেশের লোক? কোন্ পাটির লোক? বলুন। বলতে হবে। আমরা জানতে চাই।

জনতার প্রশ্নে অভিভূত মস্তিষ্ক চকিতে লেটেন হয়ে উঠল।

হিন্দু? পাঞ্জাবের ধাকার হুগত পর্ববহার। কোন উদ্ভাষ? অথবা কোন রাজনৈতিক দলের কোন বড়বড়ী? বাবার মন্ত্রীমণ্ডলী কতটা মনে পড়ে গেল। হতভাগ্য ভারতবর্ষের! সন্তানকে স্বাধীনতা দিয়ে ছিন্থিনি খেলার আরোজন চলেছে, শুণ্ড মরণা চলেছে, কলকাতা-লোকপতায় খেলা চলেছে বিভিন্ন-নেতা-নিমন্ত্রিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে। এই অল্পখানই লভ্য। এই মত্যা। এই তো করেকদিন আগে মহাত্মাকে হত্যার অভ্যর্থনা প্রদেহিল। আজই যখন মহাত্মাকে হত হলেন হিন্দুতে,

মবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

ঠিক সেই সময় খবর এল—অমৃতসরে পণ্ডিতজীর সভার দুজন লোক ধরা পড়েছে বোমা নিয়ে।

কে এরা ? কারা এই ষড়যন্ত্রীর বল ? কোভে ঘূণায় অন্তর ভাঁরে উঠল। নির্বাককোভে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। 'কে এরা ? কারা ? কারা ?

আনালাটা বন্ধ ক'রে ফিরলাম। সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন কথা ব'লে উঠল—আমি—আমি তাদের নেতা।

ঘরখানির অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে কেউ যেন উত্তর দিলে। চমকে উঠলাম। প্রশ্ন করলাম কে ?

আমি।

আলোর স্রুইচে হাত দিতে গলাম। কিন্তু স্বর শুনলাম, থাক। আলো জ্বেলো না।

'আলো জ্বলবে না ?

না।

আলো না জ্বালে তোমায় দেখব কি ক'বে ?

অন্ধকারের মধ্যেই আমাকে দেখতে পাবে। যে হেতু না, অন্ধকার থেকেই আমার উদ্ভব, অন্ধকারই আমার কায়ার উপাদান, অন্ধকারই আমার জননী। ~~আমার~~ আলো আমার বিমাতা। বিনতানন্দন গুরুড়ের আবির্ভাবে ~~আমার~~ অন্ধকার ~~আমার~~ সন্তান সর্পকুলকে যেমন আত্মগোপন করতে হয়, তেমনই ~~আমার~~ আত্মরক্ষার জন্যই আমাকে আলো থেকে দূরে থাকতে হয়। আলো তুমি জ্বেলো না।

সঙ্গে সঙ্গে আমার বিশ্ববিস্তারিত দৃষ্টির সম্মুখে অন্ধকারের মধ্যে কেউ যেন এসে দাঁড়াল। অন্ধকারের মধ্যেও গাঢ়তর অন্ধকারের মত সে

নবমহাপ্রস্তান উপাখ্যান

মূর্তি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ হ'ল। শিলামূর্তির মত কঠোর পেশীবদ্ধ দেহ, ঈষদীপ্ত তীক্ষ্ণ কুর দৃষ্টিসম্পন্ন কুণ্ড চক্ষু, ঘন ঋসপ্রথালে স্ফীত স্থূল নাসা, তিক্ততার বক্রভঙ্গিতে দৃঢ়বদ্ধ দীর্ঘ স্থূল ওষ্ঠাধর; গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সৈ ভূষিত, বিবিধ মারণাস্ত্রে সজ্জিত সে মূর্তি। বিশ্রবে আতঙ্কে হতবাক হয়ে আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। সঙ্গে সঙ্গে অমুভব করণাম, সমগ্র পারিপার্শ্বিক ঘেন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে, আমার চারি পাশে পৃথিবী নাই, সৃষ্টি নাই, আছে শুধু অন্ধকার—আর অন্ধকার—আর অন্ধকার। অন্ধকারাচ্ছন্ন কোন ঘন অরণ্যালোকের মধ্যে কঠিন শিলাতলে ব'সে আছি। দেখতে পাচ্ছি, সম্মুখে সে ব'সে আছে, চোখে তার অন্ধকার-পর্বতগহবরে উপবিষ্ট ব্যাঘ্রের চক্ষুদীপ্তি, তার ঋসপ্রথাসের মধ্যে নাগ-নিম্বাসের ধ্বনি ও স্পর্শ। সে তার দৃঢ় মূর্তিবদ্ধ প্রকাণ্ড রোমশ হাতখানি একটি শিলাখণ্ডের উপর রেখে বললে, আমারই নির্দেশে নিহত হয়েছে তোমাদের গাঙ্গী। এই মাত্র তুমি অন্তরে অন্তরে প্রণীত করছিলে, কারা-এই বড়যন্ত্রীর দল? তাই আমি এসেছি। আমিই নেতা। আমারই নির্দেশ।

কে তুমি?

আমি? চেন না আমাকে? সে হাসলে। সে হাসি দেখে আমি শিউরে উঠলাম। হাসি মায়ুবকে এমন ভয়করবর্ণন' করে তুলতে পারে এর পূর্বে আমার কল্পনাতে ছিল। সে বললে, তুমি আমাকে জান, আমাকে চেন, পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে আমার অধিকার, আমি আছি। কিন্তু এমনভাবে কখনও আমাকে দেখ নি, দেখতে চেষ্টা কর নি। আমি হিংসা।

হিংসা!

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

ঘৃণা করছ আমাকে ? দৃঢ় সৃষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে সে আশ্ফালিত করলে,
উত্তেজনার চোখের দৃষ্টি প্রথরতর হয়ে উঠল অম্ল্যস্তপ্ত ধাতু-গোলকের মত ।

আমার মনশ্চক্রে সন্মুখে উদ্ভাসিত ছিল একখানি হাস্তসুন্দর মুখ ;
ওই ভয়ঙ্করদর্শন হাসি দেখামাত্র প্রতিক্রিয়াবশে স্মরণে উদ্ভিত হয়েছিল
শশাঙ্করেখার মত মধুর হাস্তময় গাঙ্কীকীর মুখ । তার প্রশ্নে, তার দৃষ্টিতে,
তার বাহু-আশ্ফালনে আমাকে বিচলিত করতে পারলে না, আমি শাস্ত
সংঘত কণ্ঠে সত্য উত্তর দিলাম, ঘৃণা কিনা জানি না, কিন্তু তোমার ওই
ভয়ঙ্করদর্শন হাসি দেখে সঙ্কুচিত হচ্ছি । না হয়ে পারছি না ।

আমার প্রকৃতিদত্ত এই রূপ । আমি কি করব ? জান আমার
পরিচয় ? আত্মশক্তি থেকে আমার উদ্ভব । আমি শক্তির পুত্র ।

শক্তির পুত্র ?

হ্যাঁ, শক্তি । আত্মশক্তির এক চক্ষে উজ্জ্বলবর্ণী দীপ্তি অর্থাৎ
আলোক, অপর চক্ষে হিমবর্ণী তমসা—অন্ধকার, তৃতীয় নেত্রে জ্যোতিঃ—
অবর্ণনীয় তার রূপ ও স্পর্শ । সৃষ্টির প্রারম্ভে, সৃষ্টি চাইলে তাঁর প্রসাদ,
তিনি দুই চক্ষু দিয়ে চাইলেন সৃষ্টিব দিকে । তৃতীয় নেত্র থাকল উদ্বে-
গাবদ্ধ । দুই চক্ষু থেকে পৃথিবী পেলো দিবা এবং রাত্রি,—আলোক
এবং অন্ধকার বস্তুজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত হ'ল অন্ধকার-চোখের ছায়া,
হীরকে সঞ্চারিত হ'ল আলোক-চক্ষের প্রসাদ ; প্রতিটি অণু প্রতিটি
পরমাণু আলোক এবং অন্ধকার—জীবন এবং মৃত্যুর শক্তিতে বলশালী
হয়ে উঠল ; জীব-জগৎও পেলো উভয় নয়নের দৃষ্টির প্রসাদ ; আলোক-
নয়ন থেকে সৃষ্টি হ'ল—সাহসের, মেহের, শারল্যের, সংঘমের । বস্তুজ্ঞান
তাদের শাস্ত্র । এদের নেতাক্রমে আবিস্কৃত হ'ল শৌর্য ! অন্ধকার থেকে
সৃষ্টি হ'ল—ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ । এদের নেতাক্রমে আবিস্কৃত

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

হলাম আমি। আমার নাম হিংসা। স্বার্থবুদ্ধি আমাদের শত্রু। আলোক-সন্তান শৌর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী আমি। ক্রোধ, ঘৃণা, লোভ, স্বার্থ, মোহ আমার সহোদর; অন্ধকার থেকে আমাদের সৃষ্টি।

অকস্মাৎ সে উঠেদাঁড়াল। জুই হাত কোণ্ডে শূন্যলোকে প্রসারিত করে দস্তে দস্ত বর্ষণ করলে, তারপর হাত নামিয়ে আক্ষেপপূর্ণ কণ্ঠে বললে, জান, আমার কত ক্ষোভ! আমার কোণ্ডের কাছে পৃথিবীর নগ্ন সমুদ্র গোপদহৃত্য। আমাদের দুঃখের কাছে পৃথিবীর অরণ্যানীর অন্ধকার তুচ্ছ। আমিই ছিলাম একদা পৃথিবীতে জীব-জীবনের একচ্ছত্র কেন্দ্রপতি। আমার সহোদরেরাই ছিল তাদের জীবনের সকল বিকের দিকপাল। অন্ধকার শিলাময় শুভায়, অরণ্যানীর আলোকহীন তলদেশে, সমুদ্রের অলরাশির অভ্যন্তরে জীবজগৎকে স্রবণ কর। একচ্ছত্রাধিপতি আমি সেখানে। একমাত্র মাতৃস্নেহের মধ্যে আলোকের সৃষ্টির অধিকার ছিল। শক্তি নারীকপিণী, মাতার স্নেহ আমারও ভোগ করেছি, তাই তাকে স্থান দিতে আপত্তি করি নি। কিন্তু আশ্চর্য! আশ্চর্য!

সে স্তব্ধ হ'ল।

প্রশ্ন করলাম, কি আশ্চর্য্য?

আলোক-নরনের সৃষ্টির শক্তি; জীব-জীবনের মধ্যে থেকে সে আরম্ভ করলে তপস্তা।

কারণ তপস্তা?

ওই উর্ধ্বগত তৃতীয় নয়নের তপস্তা। তৃতীয় নয়নের প্রসাদ পেলে। বহুজন্মের মধ্য দিয়ে জীবজগৎ লাভ করলে মনুষ্যজন্ম। তৃতীয় নয়ন তাকে দিলেন চৈতন্ত্য, আত্মজ্ঞান, প্রেম। আর একটা সর্বনাশ বস্তু তাকে দিলেন—কল্পণ। সঙ্গে সঙ্গে আমিও আরম্ভ করলাম তপস্তা।

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

তুমিও তপস্তা আরম্ভ করলে ?

করলাম বইকি। করেছি বইকি তপস্তা। কষ্টিন—কঠোর তপস্তা করেছি আমি। কোটি কোটি বৎসর তপস্তা করেছি। আজও কি সে তপস্তার বিরাম আছে ? শীত ঋতুতে অনাহারী, দিবর-বিহারী সাপকে দেখেছ ? তারই মধ্যে চলেছে আমার তপস্তা। বর্ষণমুখর গভীর অমাবস্তার রাত্রে প্রতীক্ষমান পথিকহত্যাকারীর চিত্র কল্পনা করতে পার ? দুর্যোগ মাথায় ক'রে সেই আমার তপস্তা। আমার তপস্তাতেই তো দৈত্যজননী দিতি হলেন পুত্রবতী। মানবের সঙ্গে সৃষ্টিতে আবির্ভূত হ'ল দৈত্যদানব অসুর। বার বার আমি অসুরের মধ্যে জন্ম নিয়েছি, শক্তির তপস্তায় শক্তিকে তুষ্ট করেছি, বললাভ করেছি। রক্তবীজের নাম শুনেছ ? মহিষাসুরের নাম শুনেছ ? আমি—আমিই তার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছি।

জানি। তুমি বার বারই বিনষ্ট হয়েছ শক্তির দ্বারা।

সেই তো আমার জয়। সেইখানেই তো লাভ করেছি আমি নবজন্ম। রক্তপাতে আমার আনন্দ, সে আনন্দ আমার পরিস্ফুট হয়েছে শক্তির শূলাঘাত-নিঃসৃত আমারই রক্তধারায়। মাতা হলেন পুত্রহন্ত্রী, এর চেয়ে বড় জ্বর আর কি হবে আমার ! তাই তো দেখতে পাবে, রাবণরূপে যখন আবির্ভূত হলাম, তখন শক্তি আবির্ভূত হন নি ; আমার সঙ্গে যুদ্ধে, আবির্ভূত হলেন এক কোমলতনু শ্রামকলেবর রাজার ছেলে, তোমাঘের সীতাপতি রাজারাম। চণ্ডীর “ইত্থং যদা যদা বাধা দানোবাধা ভবিষ্যতি, তদা তদা অবতীৰ্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষরং” মনে আছে ? এই কারণেই ওই উক্তিক'রেও তিনি আর আবির্ভূত হন নি। তাঁর পরিবর্তে এলেন রাম। মানুষ। দেবতার চেয়েও ভয়ঙ্কর শত্রু আমার।

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

তোমার কথার যুক্তি কোথায় ? রামচন্দ্রের হাতে রাবণের মৃত্যুও তো রক্তপাতের মধ্যে !

হ্যাঁ হ্যাঁ। রক্তপাতের মধ্যে। কিন্তু তবু প্রভেদ আছে। তুমি বুঝবে না। আমি উপলব্ধি করেছি। বিচিত্র সে উপলব্ধি। মহাশক্তির শূলাঘাতে মহিষাসূরীজন্মের অবসান হ'ল, ক'রে পড়ল আমার রক্তধারা, শক্তির দিকে চেয়ে দেখলাম, সে মুখে জয়ের উল্লাস নাই, মমতার বেদনা নাই, নির্লিপ্ত নিরাসক্ত দৃষ্টি; অবয়বে চাঞ্চল্য নাই, নিবাত-নিম্পন্দ অগ্নিশিখার মত স্থির সে মুক্তি। রক্তবীজ-জন্মের অবসান আরও বিচিত্র। সেখানে গোলজিহ্বা প্রসারিত ক'রে মহাশক্তি আবির্ভূত হলেন চামুণ্ডরূপে, আমারই সহোদর ক্রোধকে সহায় ক'রে। শেখ রক্তবিন্দু পান ক'রে রক্তবীজকে হনন করলেন। আমি আক্রোশে বিমুগ্ধিত শক্তি নিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করলাম। বিব্রত হলেন, চিন্তিত হলেন শক্তি। মানুষ তখন বললেন, এ ভার আমি নিলাম। হে জননীকৃপিণী দেবতা, এ তোমার করণীয় নয়। তোমার তৃতীয় নরনের প্রসাদ আমাকে করেছে অমোঘ বগশালী। আমিই নাশ করব ব্রাহ্মসরুপী হিংসাকে। আমি হেসেছিলাম মনে মনে। রামচন্দ্রের শরাঘাতে রক্তশ্রোতের মধ্যে শায়িত হয়ে যখন আমি চিন্তা করছি, পরজন্মে কোন ভয়ঙ্কর রূপ আমি গ্রহণ করব তখন রামচন্দ্র বিনীতভাবে স্নানমুখে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। মহাবীর ব'লে আমাকে সোধোন ক'রে আমার মৃত্যুতে করুণায় নয়ানাক্রম্ব বিসর্জন করলেন।—সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় অচিন্ত্যপূর্ব ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল!

অকস্মাৎ বিচলিত হয়ে দুই হাতে মুখ আবরিত করলে সে। সর্বদেহে একটা কম্পন সঞ্চারিত হয়ে গেল।

নবনবাপ্রস্থান উপাখ্যান

আমি মোহমন্তের মত শুনিছিলাম সেই ভীমবর্ষন কৃষ্ণকায়, পুরুষের কথা। কোতুহলের সীমা ছিল না। কোতুহলবশবর্তী হয়েই প্রশ্ন করলাম, কি সে সংঘটন?

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিরতিশয় কাতর ক্রান্ত কণ্ঠে সে বললে, বিচিত্র সংঘটন! ওই বিজয়ী শ্রামকলেবর তরুণ মানব-পুত্রের আয়ত চোখ দুটি থেকে ঝরে পড়ল যে উষ্ণ অশ্রুধারা, সেই অশ্রুর স্পর্শে আমি বিগলিত হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, বিগলিত। গ'লে গেল আমার অম্লর-রাক্ষসরূপের কায়; ঝরে গেল কায়ার কদর্যতা।—আমি পেলাম নবরূপ। পুরাণ খুঁজে দেখ, ইতিহাস খুঁজে দেখ, অম্লর-রাক্ষসরূপে আর আমাকে পাবে না। এই আমার প্রথম পরাজয়। অস্ত্রে আমার রক্তপাত ঘটেছে, কিন্তু পরাজয় ঘটে নি। মায়ূবের শৌর্যকরণার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার অম্লর-জন্মের অবসান ঘটিয়ে আমাকে শক্তিহীন করলে। তীক্ষ্ণবস্ত্র, প্রধরনখ, বিশালদেহ হারালাম, হারালাম রক্তপানের কচি, হারালাম নরমাংসভক্ষণের প্রবৃত্তি।

অস্থির হয়ে উঠল সে। আমি বিষয়ে অভিভূত হয়ে ব'সে রইলাম। কয়েক মুহূর্ত পরে স্থির হয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে কৃষ্ণবর্ষ পুরুষ বললে, পরজন্মে আমি আবিভূত হলাম কোরব-বংশে অন্ধের গুঁরসে দম্ভ স্বার্থ মত্ততাকে সহায় করে দুর্ঘোষনের মধ্যে। আমার খেলা আরম্ভ করলাম পাণ্ডবদের পীড়ন করে, তাদের রাজ্য অপহরণ করে। পীড়িত হ'ল আলোক-নয়নের প্রসাদ, তৃতীয় নয়নের প্রসাদ বিচলিত হ'ল। আমার প্রভাবে, আমার তাড়নায় তারা হ'ল পঞ্চ-পাণ্ডবের মতই নির্বাসিত, নির্ধাতিত; দ্রোণদীর মতই লাঞ্চিত। অমিতব্যয়ী লতাকৃপী ভীষ্ম অল্পমূল্যে আমার কাছে হলেন আত্মবিক্রিত;

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

বিজ্ঞানের শৌৰ্ষকে ক্রয় করলাম সম্পদ-মূল্যে ; পুত্রের ছত্ত্বের মূল্যে
দ্রোণরপী ব্রাহ্মণের শত্রুবিজ্ঞানকে করলাম আজীব্য হাঙ্গ। আরম্ভ হ'ল
বন্দ। শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠিরের পাশে। আরম্ভ হ'ল কুরুক্ষেত্র।
*এবার কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ নিজে অস্ত্রধারণ করলেন না। শুধু তাই নয়,
আমাদের মৃত্যুতে আমার মা তাঁকে দিলেন অভিসম্পাত, সে
অভিসম্পাতকে তিনি সসম্মানে শিরোধার্য করলেন। এর ফলে আমার
ঘটল আবার পরাজয়। মহানারকের বীরজন্ম লাভের শক্তির আমার
অবসান ঘটল। সাধারণ মানুষের অন্তরের মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য
হলাম। তৃতীয় নয়নের প্রসাধ—আত্মজ্ঞানের বিপক্ষে, প্রেমের বিপক্ষে
স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা বস্তুজ্ঞানকে আরম্ভ ক'রে অভিধান আরম্ভ করলাম। কিন্তু
তবু আমার শাস্তি নাই, তবু আমার স্বস্তি নাই, আমার শত্রু আবার
আবির্ভূত হ'ল। নূতন তার যুদ্ধনীতি। তৃতীয় নয়নের মহাপ্রসাধ সে
এক মহাশক্তি—করুণা, প্রেম, সেই বলে বলীয়ান হয়ে এল এক মৃদুস্ব।
যুগ্মিতমন্তক, নয়নে দ্বিষাভ্যাতি ওই—ওই শক্তির তৃতীয় নয়নের জ্যোতির
প্রতিচ্ছটা তার চোখে, অধরে শাস্ত হস্ত, রসনার মধুর ভাষা, পরিধান
গৈরিকবস্ত্র, হাতে ভিক্ষাপাত্র, বললেন, আমার এই ভিক্ষাপাত্রে দাঁও
তোমার অন্তরের হিংসাকে, তোমরা গ্রহণ কর আমার অহিংসা,
মহাবীরের উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মজ্ঞান ও করুণা, তারই নাম অহিংসা।
মৃত্যুর পরিবর্তে গ্রহণ কর অমৃত। জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে রচনা কর
শাস্তি এবং প্রেমের স্বর্ণলেহু। উত্তীর্ণ হও জন্ম মৃত্যুর পরপারে
অমৃতলোকে। রাজার ছেঁলে গৌতম, তৃতীয় নয়নের তপস্তার করুণাকে
অজস্রধারায় অমৃতের মত বিতরণ ক'রে দিলেন আমার প্রভাবজ্ঞের
মানুষের সমাজে। রাজচক্রবর্তী অশোক করলেন সর্বস্বত্যাগ, কলিকট্বে

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

আমার ক্রীড়নক চণ্ডাশোক—ওই অমিতাভ বুদ্ধের অমৃত স্পর্শে আমাকে
তাগ ক'রে হ'ল ধর্মাশোক। দেবদত্তের মধ্যে আমি হলাম পরাভূত।
উন্নত হস্তীর মধ্যে আমি হলাম লজ্জিত, অভিভূত, পরাজিত। সে এক
অপরূপ সম্মোহন! দেখেছ কখনও মন্ত্রসম্মোহিত সর্প? আমার অবস্থা
হ'ল ঠিক তাই। বুদ্ধের তিরোধানে আবার হলাম জাগ্রত। আমাকে
জাগ্রত ক'রে তুললে স্বার্থ, আমাকে জাগ্রত ক'রে তুললে লোভ,
আমাকে জাগ্রত ক'রে তুললে ক্রোধ, মন্ত্রণা বিলে স্বার্থবুদ্ধি। একটা
স্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠলাম। কঠিন ক্রোধে জাগ্রত হলাম। খুঁজে বের
করলাম নূতন লীলাক্ষেত্র। গ্রীস দেশে ছুটে গেলাম, রোম রাজ্যে ছুটে
গেলাম। নূতন ক'রে আরম্ভ হ'ল আমার অবাধ রাজত্ব। রক্তাক্ত রথচক্রে
অভিবান চলল আমার। দেশের পর দেশের মানুষ হ'ল পদানত,
পরাজয়ের জ্বালা দিয়ে হৃদয়ক্ষেত্র পুড়িয়ে দিয়ে সেই দগ্ধ ক্ষেত্রে পাতলাম
আমার আসন। কিন্তু—

আবার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে, কিন্তু আবার এল
আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। কুমারীর গর্ভে হ'ল তার জন্ম। সে বললে, ঈশ্বর
আমার পিতা।

কে? ক্রাইস্ট?

ই্যা। মেরীর শিশু। যীশু। খ্রিস্টাস ক্রাইস্ট। ক্রসে বিদ্ধ ক'রে
আমি তাকে হত্যা করেছিলাম।

আতঙ্কে শিউরে উঠল সে। তার তীক্ষ্ণ তীব্র কৃষ্ণ দ্যুতিময় ক্ষুদ্র চোখ
ছটি ক্ষণেকের জন্য লভয়ে মুদ্রিত হ'ল, আতঙ্কে বললে, মৃত যীশু এবার
আক্রমণ করলে মানুষের অন্তরের গুপ্তস্থানে। সেখানেই এক সোমবারে
তার ঘটল পুনরাবির্ভাব। আমি ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম দুর্গম মধ্য-

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

এশিয়ায়। সেখানে থেকে আবার অভিযান চালানাম নিষ্ঠুর আক্রোশে।
হুনেদের নিয়ে এটিলা চলল আমার নির্দেশে ইউরোপে। মিহিরকুল
এল ভারতবর্ষে। এর পর সুদীর্ঘ কাল চালিয়ে এসেছি আমার অবাধ
রাজত্ব। আলোকের সৃষ্টি—শৌৰ্য লোভের বশবর্তী হয়ে, স্বার্থবুদ্ধি-
প্রভাবিত বস্তুজ্ঞানের প্ররোচনায় হ'ল আমার সহায়। এই বস্তুজ্ঞানকে
স্বার্থবুদ্ধি প্রভাবিত ক'রে রূপান্তরিত করলাম শুষ্ক-জ্ঞানে। অভিনব
কৌশলে আলোকের সৃষ্টির মধ্যে বাঁধলাম বাঁসা। তাদের করলাম
প্রধান, আমরা থাকলাম পশ্চাতে, অধীনতা স্বীকার ক'রেও হলাম তাদের
সত্যকার পরিচালক। শুষ্কজ্ঞান লাভ করলে শুষ্কর পদ। সে বললে,
এই নূতন পথই সত্য, অনুসরণ কর এই পথ। মিথ্যা তৃতীয় নয়নের প্রসাদ।
ওসব হ'ল ভ্রান্তি মোহ। তার অস্তিত্ব পর্যন্ত কর অস্বীকার। শৌর্ষের
অন্তরালে থাকলাম আমি হিংসা। সে নূতন বোষণা-পত্র দিলে মানুষের
সমাজে—“বীরভোগ্যা বস্তুদ্ধরা। জয় কর পৃথিবী।” বস্তুজগৎ থেকে মৃত্যু-
শক্তিকে করলে গ্রহণ। অসুর-রাক্ষসের জন্মে যে সৃষ্টি, যে গৌরব, যে
প্রতিষ্ঠা আমি লাভ করি নি, তাই লাভ করলাম মানুষের জন্মে। রক্তাক্ত
ক'রে দিলাম পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা।

আত্মতৃপ্তিতে সে তীক্ষ্ণগ্র দস্তপংক্তি প্রকট ক'রে দীর্ঘওষ্ঠাধরবিস্তারী
হাসি হাসলে। আমি ভীত হলাম। বললাম, তুমি হেসো না। তোমার
হাসিতে আমার ভয় হয়।

সে বললে, হবারই কথা। কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করলে মানুষ পীড়িত
হয় না, কিন্তু সে গান করলে লুহ করা যায় না। আনি, স্বীকার করি।

আমি বললাম, তুমি নিষ্ঠুর অট্টহাস্ত কর, সে হাসি লুহ করব; কিন্তু
এ হাসি নয়।

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

সে বললে, কি করব ! সে হাসি হাসবার যে উপায় নাই । মানুষের মধ্যে আমার অকপট রূপের যে আর স্থান নাই । আমাকে চলতে হয়, ফিরতে হয় ছদ্মবেশে, কপট ভাষায় কথা বলতে হয়, অহুকরণ ক'রে বিরক্ত কর্তে—কোথাও মিষ্টতার, কোথাও মর্যাদার ভূঁয়ান করতে হয় । কাইজারের যুদ্ধবোষণা-পত্র পড়েছ ? ভাসাইয়ের সন্ধিপত্রের ভাষা দেখেছ ? পড়েছ ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরেজের বোষণা-পত্র ? হিটলারের বক্তৃতা শুনেছ ? চার্চিলের উক্তি স্মরণ করতে পার ? সর্বত্র—সর্বত্র প্রচ্ছন্নভাবে আছি আমি ।

গভীর আত্মতৃপ্তিতে সে অহঙ্কৃত হয়ে উঠল, স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল গাঢ় অন্ধকারের দিকে । বুঝলাম, আপনার অহঙ্কারকে সে পরিতৃপ্তিসহকারে উপভোগ করছে ।

এবার আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে পারলাম না । সে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছ যে ?

বললাম, তুমি সত্য বলেছ । জয় তোমারই হয়েছে । সৃষ্টির আলোক-নয়নের সন্তানদের তপস্যা ক্লাস্ত হয়ে ব্যর্থ হয়েছে ।

অকস্মাৎ ত্রোদে সে যেন অধীর হয়ে উঠল, বললে, তুমি মিথ্যা কথা বলছ ।

মিথ্যা বলছি ?—বিস্মিত হলাম আমি ।

হ্যাঁ । তোমার অন্তর আমি দেখতে পাচ্ছি । এ তোমার অন্তরের সত্য নয় ।

আমি প্রবলতর বিশ্বাসে আমার মনের দিকে চাইলাম । সে গভীর কর্তে বললে, আমি জানি, আমি জানি, এই যে ভূখণ্ড—এই ভারতবর্ষ, এর মানুষ তোমরা, তোমরা অতি বিচিত্র ধাতুতে গঠিত । এখানে যত

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

পরাজয় খত আঘাত আমাকে পেতে হয়েছে, এত আঘাত কোন দেশে আমাকে পেতে হয় নি। অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে, পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ভূখণ্ডে অবাধে চালিয়ে চলেছিলাম আমার রাজত্ব। বুঝতে পারি নি, এখানে চলছে সেই তৃতীয় নয়নের তপস্যা। অসুমান করা আমার উচিত ছিল। ইয়া, উচিত ছিল। যুদ্ধের পরও এখানে অনেক শত্রু জন্মেছে আমার। কবীর, চৈতন্য—নানক—অনেক—অনেক। এখানকার মানুষেরা রক্তের ধারার মধ্যে পুরুষায়ুক্রমে বহন করে নিয়ে চলছে ওই সাধনার ধারা। সেই সাধনায় জন্ম নিল এই মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে যখন সে অহিংসাকে প্রচার করে, তখন আমি বিব্রত হয়েছি; কিন্তু তবুও প্রত্যাশা করেছিলাম, এ অহিংসা ওর কুটযুদ্ধের ছদ্মবেশ। আমার আশ্বাস ছিল, গান্ধী জয়যুক্ত হ'লেও আমি নূতন আসন পাশ উভয় দেশের মানুষের মধ্যে। কিন্তু ভ্রম—এত বড় ভ্রম আর হয় না। আজও পর্যন্ত আত্মজ্ঞান, প্রেম, বীৰ্য্যের সাধনায় এমন অপরূপ সিদ্ধি কেউ লাভ করে নাই। আমার এত বড় পরাজয় আর কোথাও ঘটে নাই। এত শুভ্র জ্ঞানধর, এমন বীৰ্য্যময় অহিংসাকে জীমুতবাহনের মত নবজন্ম কেউ দেয় নাই। ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে এক সুরে গেঁথে আমাকে এই ভূখণ্ড থেকে বিতাড়নের—

হঠাৎ সে স্তব্ধ হ'ল। তারপর গাঢ় স্বরে বললে, বিতাড়নের নয়, বিতাড়নের নয়। আমার সকল কদর্যতার অবসান ঘটিয়ে সে আমাকে বিগলিত করে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল মহাশক্তির মধ্যে। তাতে কি হ'ত জ্ঞান ?

কি হ'ত ?

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

মহাশক্তির অঙ্ককার-নয়ন প্রস্ফুটিত হ'ত। তৃতীয় ওই যে উর্ধ্ব লোকে নিবদ্ধ হয়ে তপস্তামগ্ন—ওই নয়নের সঙ্গে অপর দুই নয়নের সংযোজন রচিত হ'ত। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে, আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে লেতুবন্ধন ঘটত; জন্ম ও মৃত্যুর সংযোজনে সৃষ্টি লাভ করত জন্মত; আলোক এবং অন্ধকারের সংযোজনে অন্তরলোক উদ্ভাসিত হ'ত অখিনশ্বর জ্যোতিতে। তাই—তাই এই মানুষটি ছিল আমার কঠোরতম শত্রু। তাকে কি আমি না সরিয়ে পারি?

তীব্র বিরক্তিতে আমার মন ভরে উঠল, আমি বললাম, কিন্তু এর জন্য ভারতবর্ষের হিন্দুকে কেন তুমি আশ্রয় করলে?

তুমি জান না। এমন ক্ষেত্রে স্বজাতি,—জাতি এরাই আমার প্রধান আশ্রয়। গোতমবুদ্ধের বিরুদ্ধে আমার ক্রীড়নক হয়েছিল তার নিকট-আত্মীয় দেবদত্ত, যিশুর বিরুদ্ধে আমার স্বপক্ষে পেয়েছিলাম তার স্বজাতিকে। সৃষ্টির মধ্যে এই সাধনায় আসে যে সাধকেরা, তাদের আবির্ভাব আমি কঠিনতম আঘাত পাই তার নিকট-জনের হৃদয়ক্ষেত্রে, আলোড়ন সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক ওঠে সেইখানে। তাই সেইখানেই রচনা করি আমি আত্মরঙ্গার বুদ্ধকে। শুকজ্ঞান আমার শ্রেষ্ঠ সহায় মানুষের মধ্যে, সেই রচনা করে স্বার্থের পাষণধণ্ডের ভিত্তির উপর সংকীর্ণতার উপাখ্যান দিয়ে ভ্রান্ত আশ্রয়ের ব্যুৎপাটীর। ময়দানবের দানবীয় শিল্পের কথা জান? জলপূর্ণ হৃদকে মনে হয় তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র; তৃণক্ষেত্রে ক্রম হয় জল ব'লে। ঠিক তেমনই। অন্ধকারের আবরণ বিস্তার ক'রে দৃষ্টি করি আচ্ছন্ন, শুকজ্ঞানের রচিত ব্যূহের অন্তরালে বীর্ষকে করি উন্মত্ত। আমি আশ্রয় করি অন্তের অগ্রভাগে।

জ্বলতে লাগল তার চোখ। ভয়ঙ্করদর্শন হিংসা অধিকতর ভয়ঙ্কর-

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

বর্শন হয়ে উঠল। আমি নির্বাক হয়ে ব'লে শুনে গেলাম তার কথা।

সে বললে, শুক্লজ্ঞানের প্রেরণায় হিন্দুর মনেই সঞ্চারিত করেছি হিন্দু স্বার্থহানির প্রচণ্ড স্ফোভ। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ-বিবেকে এ দেশে আমার যে জরথবনি উঠল, যে জরথাত্রা চলল, তারই বিরুদ্ধে দাঁড়াল এসে গান্ধী। শুরু হ'ল অভিযান। পশ্চাৎপদ হতে হ'ল। আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে সবচেয়ে নিকটে পেলাম হিন্দুকে। বেথলাম, সেখানে ব্যুহ রচিত হয়ে আছে। তাকে অঙ্গুলিনির্দেশে বেথলাম ভ্রান্ত কল্যাণের আদর্শ, বেথলাম রাজনৈতিক অধিকারের উচ্চতম প্রতিষ্ঠার ছদ্মবেশী লোভ। উন্নতির মত সে চলল। গান্ধীর সম্মুখে এসেও সে বিচলিত হ'ল না। গুলি করলে। গান্ধীজী করছোড়ে প'ড়ে গেলেন রক্তাক্ত হয়ে মাটির উপর।

তুই হাতে আবার সে মুখ ঢাকলে। তারপর বললে, তার সে করছোড়ে নিবেদন—সে হ'ল মার্জনা। সে মার্জনা কাকে করলেন জান ? আমাকে। হত্যাকারীকে নয় হত্যাকারী অবিচলিত আছে। সে তার ভ্রান্ত আদর্শ নিয়ে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করবে। কিন্তু আমি—আমি—

অকস্মাৎ সেই গাঢ় অন্ধকারাশিকে মথিত ক'রে অটহাস্ত যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল। আমি যেন সখিত হারিয়ে ফেলছিলাম। তারই মধ্যে বেথলাম, সে থরথর ক'রে কাঁপছে, তার ক্লান্তবর্ণ মুখমণ্ডল শুভ্র নীরল হয়ে এসেছে। সে অন্ধকারাশির দিকে চেয়ে অশ্রুট কণ্ঠে বললে, মহাকাল।

আতঙ্কিত হয়ে আমিও অশ্রুট কণ্ঠে প্রশ্নের আকারে তার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলাম, মহাকাল ?

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

হ্যাঁ। মহাকাল। ব্যঙ্গ হাত ক'রে গেলেন। তারপর সে সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে বললে, করবেই তো ব্যঙ্গ। তুমি তো শুধু রুদ্ধ নও, তুমি যে শিব, তুমি যে পরম বৈষ্ণব। সৃষ্টির সাধনার মধ্য দিয়েই যে চলছে তোমার বৈষ্ণবীয় সাধনা। চলুক, আমিও দেব বাধা। জানি, এ জয় আমার জয় নয়, এ আমার পরাজয়, কারণ এত দুর্বলতা আমি জীবনে কখনও অনুভব করি নি। আজ আমি ক্লান্ত। এই অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে মাতৃক্রোড়ে, আত্মদান অনুভব করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে। জানি ও আবার আসবে, আবার করবে এই অহিংসার সাধনা। আমিও দেব বাধা—বার বার, বার বার। সম্ভবত এই ভূখণ্ডেই হবে সে পরীক্ষা। বুদ্ধির দেশ—বিজ্ঞানের দেশ এ নয়, এ দেশ চৈতন্যের দেশ, হৃদয়ের দেশ; অন্ধের দেশ নয়—বিশ্বাসের দেশ। এই দেশেই সম্ভবত হবে বার বার আমার সঙ্গে যুদ্ধ। হব আমি দুর্বল থেকে দুর্বলতর। জানি, আমার মতই নব নব জন্মে রাম আসে ক্লান্ত হয়ে, বুদ্ধ আসে যীশু হয়ে, যীশু আসে গান্ধী হয়ে, আবারও আসবে। নবমহাভারতের মহানায়কের মহাপ্রস্থানে আমার হ'ল নতুন পরাজয়, আমি ক্লান্ত, আমার চেয়ে দীনতম আজ আর কে আছে? লোকে লোকে উঠছে মহানায়কের মহাপ্রস্থান জয়ধ্বনি; মহাকাল করেছেন স্রষ্টাবাচন। আর আমি? আমি প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছি অভিভূত চিন্তে সেই চরম দিনের, যে দিন শেষযুদ্ধে হবে আমার জীবমুক্তি। কবে? সে কবে?

সে কণ্ঠস্বর অদ্ভুত, তাতে রোষ নাই, আবেগ নাই, ক্ষোভ নাই, ক্রোধ নাই; আত্মসমর্পিতের শ্রদ্ধাঘ্রিত মর্যাদাময় কণ্ঠস্বর, ভৈরবী রাগিণীর মত ধ্বনিত হচ্ছিল।

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

অকস্মাৎ দরজায় কে ধাক্কা দিলে। দরজায় খিল দেওয়া হয় নি, খুলে গেল। আলোয় ভরে গেল ঘর। সমস্ত ঘুমভাঙা বাড়ীর শিশুটি ঘর থেকে বেরিয়ে কাউকে না পেয়ে আমার সন্ধানে এসেছে। দেখলাম, রাত্রি প্রভাত হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে সমস্ত রাত্রি যা দেখেছি, জানি না—সে স্বপ্ন, না, কল্পনা। কিন্তু আমার কাছে তা মিথ্যা নয়।

রেডিওতে গান আরম্ভ হ'ল—

“হিংসায় উদ্ভ্রান্ত পৃথ্বী...

শান্তি হে—শান্তি হে—হে অনন্তপূণ্য—

করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।...”

মহাত্মার জয় হোক। এ তো মহাত্মারই বন্দনা। মহাকবি বাঙ্গালীকি রামজন্মের পূর্বে করেছিলেন রামায়ণ-রচনা। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন মহাত্মার বন্দনা। ধ্বনিত হোক হৃদয়ে হৃদয়ে এই গান। রচিত হোক অহিংসার সাধকের নবজন্মের জীবনক্ষেত্র। সমগ্র মানব-সত্যতা অহিংসা চায়, শান্তি চায়। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে সেতুবন্ধনে উত্তীর্ণ হতে চায় অমৃতলোকে। আলোক এবং অন্ধকারের সংযোজনে মানুষের অন্তরে অন্তরে উদ্ভাসিত হোক উদয়-অস্তহীন জ্যোতির্লোক। বহু বিলম্ব আছে জানি, তবু হে মহাত্মা, তোমার আত্মদানের ভরসার অকুণ্ঠ ঘোষণায় বলতে চাই—সে দিন আসবে।

কবিকণ্ঠের অমৃত বাণী পেয়েছি, মঙ্গলময় পুরুষের দক্ষিণপাণির স্পর্শ পেয়েছি, করুণাঘন ধরণীতল একদা কলঙ্কশূন্য হবেই। সেদিন যেন আমি নবজন্মে কিরে আসি। নবজীবনে লাভ করি মহাজীবন।

গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী

অনেক দিনের—পাঁচ বৎসর পূর্বের কথা ।

গ্রামে সেদিন প্রথম রেলগাড়ী আসিবে ।

ছোট একটি ব্রাঞ্চ লাইন কনষ্ট্রাকশনের সময়, মাপ জোক হইয়া গেছে—‘দাগ-বেল’ও কাটা হইয়াছে, এইবার মাটি দিয়া বা প্রয়োজনমত কাটিয়া লাইন বসাইবার জন্য পাকা পথ প্রস্তুত হইবে । তাহার পূর্বেই কোথাও অল্প কাটিয়া, কোথাও মাটি ফেলিয়া অস্থায়ীভাবে রেল লাইন পাতা হইতেছে । সেই রেল লাইন বহন করিয়া একখানা ছোট হাফা ইঞ্জিন কয়েকখানা ছোট মালগাড়ী লইয়া সন্ধ্যা সন্ধ্যাই আসিতেছে । গাড়ী হইতে কার্ঠের শ্লিপার এবং লাইন লইয়া প্রায় শতখানেক কুলির একদল স্ত্যস্ত কিপ্র নিপুণতায় সহিত শ্লিপার পাতিয়া দিতেছিল, একদল তাহার উপর ফেলিতেছিল লোহার লাইন, আর একদল লম্বা সাঁড়াশী ও হাতুড়ীর সাহায্যে ডগনেলগুলি ঠুকিয়া লাইনগুলিকে আঁটরা চলিয়াছে । লাইন খানিকটা পাতা হইলেই ছোট ইঞ্জিনটা সিট মারিয়া গাড়ীগুলিকে টানিয়া আগাইয়া আসিতেছে । এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে ইঞ্জিনটা আজ এই গ্রামে প্রবেশ করিবে । সকালবেলা হইতেই ছেলের দল গ্রাম ছাড়াইয়া খানিকটা দূর আগাইয়া গিয়া রেলগাড়ীকে তাদের অভ্যর্থনা জানাইতেছিল । তাহাদের আনন্দের সীমা নাই । দিন রাত্রি ঘন্ ঘন্ করিয়া ট্রেন চলিবে, সিটি দিবে পুঁ-পুঁ-পুঁ ! তাহারা নিজেরাও ঐ রেলগাড়ী সাজিয়াছে—একজন হইয়াছে ইঞ্জিন—তাহার কোমর ধরিয়া

গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী

একজন—এমনি করিয়া পাঁচ সাত জন পরস্পরের কোমর ধরিয়া ছেলেগুলি ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। ইঞ্জিন ছেলেটি মুখে শব্দ করিতেছে—বস্-বস্ বস্-বস্! মধ্যে মধ্যে মুখেই সিটি মারিতেছে—পুঁ!

কুলিগুলি অস্থিরাম মুখে গান ইাকিয়া কাজ করিতেছে—মারো জোয়ান!

—হেঁই ও।

—আওর খোড়া।

হেই ও।

ছেলেরা কান পাতিয়া শুনিতেছে, বোলগুলি তাহাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। এমনি করিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে যখন রেল লাইন আসিয়া পৌঁছিল তখন বেলা অপরাহ্ন। দর্শকের ভিড়ও ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। শুধু ছেলের নয়, যুবক বৃদ্ধের দলও আসিয়া জমিয়াছে। আমিও গিয়াছিলাম। তখন গ্রীষ্মের অস্ত্র কলেজ বন্ধ হইয়াছে—কয়েকদিন পূর্বেই বাড়ী আসিয়াছি।

একজন সাহেব, খাঁটি ইংরাজ বলিয়া মনে হইল, লাইনের মুখে দাঁড়াইয়া কখনও বুট দিয়া কখনও বা হাতের ছড়ি দিয়া নির্দেশ দিতেছিল। খাঁকি শার্ট ও হাফপ্যান্ট পরিহিত জন দুই বাঙ্গালী উপু হইয়া বসিয়া সেই নির্দেশ অনুযায়ী স্লিপার ও লাইন সরাইয়া নড়াইয়া ঠিক করিয়া দিয়া কুলিদের আদেশ দিতেছিল—ডগনেল লাগাও! মারো হাম্বাব!

অদূরেই একটা অস্থায়ী কামারশালাও চলিতেছে।

সকলের পিছনে গার্ডসাহেব ঝাণ্ডা ও বাঁশী হাতে ঘুরিতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একদল ছেলে জুটিয়া গিয়াছে।

গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী

লক্ষ্য করিলাম গার্ডসাহেব খুব হাত পা নাড়িয়া হরদম বক্তৃতা দিতেছেন। একটু অগ্রসর হইয়া ছেলের দলের কাছে গেলাম।

গার্ডসাহেবটি হরদম ইংরাজী ও ফিরিঙ্গী-বাংলা বলিয়া চলিয়াছেন।

তিনি তখন বুঝাইতেছিলেন—ভিলেজার কথাটা ছোট কথা—অসভ্য কথা আছে। বলবি না কখনো। বলবি রেসিডেন্ট অফ দিস্ ভিলেজ, ইউ আণ্ডারষ্ট্যান্ড-মানে বুঝি তুমি? আ? ইউ মাষ্টার—তুমি মহাশয়! লোকটি বেশ—সুদর্শন। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা—বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ, টিকলো নাক—রংও বেশ ফরসা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলিলে অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। কিন্তু তবুও আমার মনে হইল লোকটা বাঙালী হইলেই ভাল হইত। মুখে এমন কতকগুলো চিহ্ন—যেন বাঙলা মায়ের আঁচল দিয়া মুখ মুছানোর চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। মনে হয়, চোখে কাজল—কপালে টিপ—চুলে তেল এককালে মাখানো ছিল। আমি কোতুহলী হইয়া বেশ ভীক্ষুদৃষ্টিতে তাহার নাক ও কানের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। কোথাও যদি বেঁধার চিহ্ন থাকে! আশঙ্কার কর্তে পারিলাম না।

গার্ডসাহেব আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—গুড্‌ ইভনিং মাষ্টার। ইয়োর নেম প্রিজ্‌ ?

আমি হাসিয়া বলিলাম, গুড্‌ ইভনিং। মাই নেম ইজ্—অরুণকুমার মুখার্জী।

—ওয়েল মাষ্টার মুখার্জী—তোমার ত' খুব ভাল নাম! ভারী মিষ্টি! অরুণ মানে ত' বি সান্‌।

লবই তিনি ইংরাজীতেই বলিতেছিলেন।

আমি উত্তর দিলাম, ই্যা। কিন্তু আপনার পরিচয় তো পেলাম না।

গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী

—ও—! আমি হচ্ছি জন আর্ডেন চ্যাটারসন। এই রেলওয়ের একজন গার্ড।

—ভারী খুসী হ'লাম তোমার সঙ্গে আলাপ করে মাষ্টার মুকুর্জী।

—আমিও খুসী হয়েছি মাষ্টার চ্যাটারসন।

—কিছু মনে ক'র না—মাষ্টার মুকুর্জী—তুমি কোণে কোণে পড়ি ? এখানে একটা স্থল আছে নয় ?

—হ্যাঁ আছে! কিন্তু আমি এখানে পড়ি না, পড়ি কলেজে। আই-এ-পড়ি।

সবিস্ময়ে সে বলিল—হ্যাঁ! ইন্টার মিডিয়েট ইন আর্টস ? আমি খুব খুসী হলাম মাষ্টার মুকুর্জী।—কিন্তু তুমি এমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছিলেন বল তো ?

একটু বিপদে পড়িলাম, অবশেষে সংকোচ কাটাইয়া কথটা বলিয়া ফেলিলাম, বলিলাম—তুমি যেন বাঙালী হলেই ভাল হত।

চ্যাটারসনের চোখ দুইটা হঠাৎ দৃষ্টি করিয়া উঠিল। স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—তুমি ছেলে মানুষ মুকুর্জী—তাই এ কথার জন্য তোমাকে ক্ষমা করছি আমি। আর কখনও এমন কথা বলো না যেন। চ্যাটারসন চলিয়া গেল—একটু দূরে ছোট ছেলেরা গোলমাল করছিল—সেখানে গিয়া চোখ দুইটা বড় করিয়া ঠোঁটের উপর আঙুল দিয়া বলিল—উন্! চূপ! একজিকিউটভ ইঞ্জিনিয়ার- মাষ্টার গিলবার্ট! সে রাগ করবে।

একটা ট্রেন ওদিক হইতে আসিয়া থামিল। ইঞ্জিনিয়ার গিলবার্ট নামিলেন।

পার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী

ওদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সেদিনের মত কাজ বন্ধ হইয়া গেল। ছেলের দল ফিরিতে আরম্ভ করিল, আমিও ফিরিলাম।

—মাষ্টার মুকুর্জী!

ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম প্যাটারসন ডাকিতেছে। সে আমার কাছে আসিয়া বলিল—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, মুকুর্জী তুমি রাগ করবে না তো?

জিজ্ঞাসা করলাম, কি বল?

এদিক ওদিক চাহিয়া সে বলিল...এখানে তোমাদের একসাইজ শপ, মানে মদের দোকান আছে?

হাসিয়া বলিলাম—আছে।

—কোনদিকে যদি ব'লে দাও মুকুর্জী! আমি বেশী খাই না—একটু অল্প না হ'লে—। মার্জনা ভিক্ষা করার একধারার হাসি আছে, সে সেই হাসি হাসিল।

আমি বেশ ভাল করিয়া পথ নির্দেশ করিয়া দিলাম। সে এইবার বলিল—আর একটা কথা!

—কি বল?

আমাকে চার আনা পরস দেবে?

আমি অবাক হইয়া গেলাম। এত ইতর লোকটা? প্রথম আলাপেই একজন বিজাতীয় অপরিচিতের নিকট ভিক্ষা চাহিতেও লোকটার বাধে না? আর এই লোকটাই কিছুক্ষণ আগে রাগ করিয়া করিয়া আমাদের শাসাইতে চাহিয়াছিল!

অত্যন্ত রুঢ়ভাবেই বলিলাম, না। আমাকে মাপ করো তুমি।

গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী

সে কিন্তু একটুও আহত হইল না, বলিল—না-না। তুমিই আমার লজ্জাহীন আচরণ মাপ করো মাষ্টার মুকুজ্জী! অলরাইট—গুডনাইট।

সে হন্ হন্ করিয়া আমারই নির্দেশ অনুযায়ী সোজা পথটি ধরিয়া অগ্রসর হইল।

* * *

দিন চারেক পরই আবার তাহার সহিত দেখা হইল। তখনও আমাদের গ্রামের সীমানার মধ্যেই লাইন পাতা চলিতেছিল। লাইন অবশু গ্রাম ছাড়াইয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে। তবুও বাজারহাট এবং প্রয়োজনীয় জবোর সুবিধার জন্য এই গ্রামখানি তাহাদের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন রবিবার। সকালবেলায় আমাদের বৈঠক-খানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় দেখিলাম চ্যাটারসন হন্ হন্ করিয়া সম্মুখের রাস্তাটা দিয়া চলিয়াছে।

আমাকে দেখিয়াই সে অভিবাদন করিল গুড মর্নিং মাষ্টার মুকুজ্জী!

আমি প্রত্যভিবাদন করিলাম—গুড মর্নিং মিষ্টার চ্যাটারসন! আশা করি ভাল আছ!

ধন্যবাদ দিয়া সে জানাইল—হ্যাঁ সে ভালই আছে। তারপর প্রশ্ন করিল—এইটাই কি তোমার বাড়ী?

—হ্যাঁ। এস না, এলে খুব খুসী হব!

সে সঙ্কোচভরে বলিল—তোমার বাড়ীতে মেয়েরা—

হাসিয়া বাধা দিয়া বলিলাম—না, না, এটা আমাদের বাইরের বাড়ী; এখানকার সঙ্গে অন্যরের কোন সম্বন্ধ নাই।

গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী

—আই সি! কি বল তোমরা—বৈঠখানা, না কি? ওঃ সুন্দর বৈঠখানা তোমার মুকুর্জী। বাঃ সুন্দর বাগানটি।

আমি বোধ হয় একটু খুসী হইয়া উঠিয়াছিলাম। বাগান হইতে নিজেই একটা গোলাপ তুলিয়া তাহাকে উপহার দিয়া বলিলাম—এটা নিলে খুব খুসী হব আমি। সে বারবার ধন্যবাদ দিয়া বলিল—মাষ্টার মুকুর্জী তুমি খুব ভাল ছেলে। এক কাপ চা খাওয়াবে আমার?

লজ্জিত হইয়া বলিলাম—নিশ্চয় নিশ্চয়! পূর্বেই আমার বলা উচিত ছিল—মাষ্টার চ্যাটারসন!

চ্যাটারসন বলিল—আর চারটি তোমার মুড়ি। একটু তেল মেখে, খুলে? আমি খুব ভালবাসি মাষ্টার মুকুর্জী!

তাড়াতাড়ি চাকরটাকে ডাকিয়া বেশ উপায়ে করিয়া আশা-কড়াই ভাজা ইত্যাদি উপকরণসহ মুড়ি ও চা আনিতে বলিয়া দিলাম—বলিলাম—দেখী করবি না, শিগ্গির আনবি।

—চ্যাটারসন চারিদিকে বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল, সে এইবার বলিল,—মাষ্টার মুকুর্জী, কিছু মনে ক'রো না, তোমার অবস্থা খুব ভাল, নয়?

একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম—অপরিচিতের এমন করিয়া কি অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতাপন্নত? তবুও উত্তর দিলাম—ভাল কাকে বল তুমি? তোমাদের জীবনের ধারা অমুখারী জীবন যাপন করতে গেলে এক কতটুকু?

সে উত্তর দিল—তুমি কি জান মাষ্টার মুকুর্জী, আমি মাত্র ত্রিশ টাকা মাইনে পাই, কলকাতায় আমার স্ত্রী আছে একটি মেয়ে আছে। তার তুলনায় তুমি কি ধনী নও? অবশ্য আমি তোমার হিংসা করছি না।

গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী

একটু বেদনা অনুভব করলাম। কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

চ্যাটারসন তারপর একে একে আমার লংসারে কে আছে কি আছে খুঁটিনাটিটি পর্য্যন্ত সংবাদ লইল। সংসারে পুরুষের মধ্যে আমি একা, বাস্তব্যসেই পিতৃহীন শুনিয়া সে হাস হাস করিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য লোক, চোখও যেন ছল ছল করিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, তুমি কি বিবাহিত মাষ্টার মুকুর্জী? বলিয়াই সে মার্জনা ভিক্ষা করিয়া বলিল, কিছু মনে করো না। তোমাদের অল্প বয়সে বিবাহের প্রথা আছে কিনা—তাই জিজ্ঞাসা করছি।

হাসিয়া বলিলাম—না না, কিছু মনে করিনি আমি। বিবাহিত আমি নই।

সে চট করিয়া বলিল, বিবাহে যেন তুমি টাকা দাবী ক'র না মুকুর্জী। ওটা তোমাদের সমাজের অত্যন্ত হীন প্রথা।

আমি এবার ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারিলাম না। একজন বিদেশী-বিজ্ঞাতীয় ব্যক্তি আমাদের সমাজকে আক্রমণ করিবে—এটা আমার সহ্য হইল না। বলিলাম—কিন্তু তোমাদের সমাজেও কি ঘোতুক প্রথা নাই?

সে অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—না, না, আমি সেভাবে কথাটা বলি নাই মুকুর্জী। তুমি মাপ করো আমাকে। তারপর হঠাৎ বলিল—সেদিন তোমাকে একটা কঠিন কথা বলেছিলাম মুকুর্জী। দেখ বাঙ্গালী হিন্দু বাড়ীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধ ছিল বাঙ্গালী হিন্দু। আমি অনেক কথা জানি তোমাদের সম্বন্ধে। দুর্গাপূজা কালীপূজা অনেক জানি। তোমাদের লক্ষ্মীপূজা আমার ভারী ভাল লাগে। ওঃ কি বলে—সুইট্‌-তৈরী করে তোমরা-পিঠা-পিঠা; পিঠা চমৎকার জিনিষ!

পার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী

কিন্তু—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমি তাদের সঙ্গে সব লংগ্রব ছেড়ে দিয়েছি। কেন জান? আমার বন্ধুর বড় একটি মেয়ে—সুন্দর মেয়ে—তার বিয়ে হ'ল না। শেষ পর্য্যন্ত—। চ্যাটারসন খামিয়া গেল।

চাকরটা এই সময়ে হুড়ি ও চা লইয়া আসিল। চ্যাটারসন হুড়ির থালা হাতে অনেক্রণ বসিয়া রহিল তারপর অশ্রুমনস্কভাবে হুড়ি ও চা খাইয়া বলিল—মুকুর্জী আজ তোমার কল্যাণে আমার সকালের খাবারের পয়সাটা বেঁচে গেল।

এ কথার কি জবাব দিব, নীরব হইয়া রহিলাম।

চ্যাটারসন বলিল—দেখ মুকুর্জী—এই যৌতুক প্রথার জ্ঞাত্ত তোমাদের কত মেয়ে পুড়ে মরেছে। সেইজ্ঞাত্ত কথাটা বলছিলাম। ওঃ টেরিবল্-মুকুর্জী, টেরিবল্! কখনও বেন তুমি যৌতুকের দাবী করো না বিয়েতে।

আমি বলিলাম—তোমার কথা মনে রাখিব মিঃ চ্যাটারসন।

সে উজ্জল হইয়া উঠিল, বলিল—ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

বিদায় লইয়াও চ্যাটারসন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বলিল, তোমার অবস্থাতো ভাল মাষ্টার মুকুর্জী, কিন্তু সেদিন চার আনা পয়সা দিতে তুমি এমন রূঢ় হয়ে উঠলে কেন?

আমি অকুণ্ঠিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সে বলিল—জান—ত্রিশটা টাকার মধ্যে এক পয়সাও আমি নিজের জ্ঞাত্ত খরচ না করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেটা আমার স্ত্রী কন্যার জ্ঞাত্তে। কুলিদের কাছে যা পাই তাতেই আমার খোরাক চলে। কিন্তু মদের পয়সাটা, ওটা ছাড়তে পারি না মুকুর্জী। তাই ভিক্ষেও করি। ভিক্ষুক বলে আজ কি চার আনা পয়সাতুমি দিতে পার না? আজ কদিন থেকে গিলবার্ট বড় কড়া

গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী

নজর রাখছে। কুলীদের কাছে পরস। আদায় করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

ধোরাধীর পরস। থেকে মদ খাই। খাওয়া হয় না।

অত্যন্ত বিবস্ত্র হইয়া লজ্জায় পড়িয়া চার আনা পরস। সেদিন দিলাম।



লোকটার উপর ঘৃণা হইয়া গেল। লোকটা আরও কয়েকদিনই আসিয়া মদের অল্প ভিক্ষা লইয়া গেছে।

একদিন বলিয়াছিলাম, মিষ্টার চ্যাটারসন তোমার মদ ছেড়ে দেওয়া উচিত। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া একান্ত অশ্রাবীর মত বলিয়াছিল—মুকুর্জী সে আমি পারি না। তুমি জাননা মুকুর্জী—আমার কি কষ্ট! আজ এক বৎসর—থাক মুকুর্জী—সে তুমি শুনতে চেয়ে না।

শুধু আমাব কাছেই নয়, অনেকের কাছেই সে এমনভাবে ভিক্ষা চায়। বৎসব দুয়েক পরাই ইহার ফলও একদিন ফলিয়া গেল। তখন লাইন খুলিয়াছে। নিয়মিত ট্রেন চলিতেছে। চ্যাটারসন গার্ডের কাজ করিতেছিল। তাহার এই মদের অল্প পরস। চাওয়ার অত্যাচারে জন-কয়েক ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া বেগওয়ার অফিসার ইনচার্জের নিকট স্বরখাস্ত করিয়া বসিল। ব্যাপারটা আমি জানিতাম না। চ্যাটারসনই আসিয়া আমার কাছে কাঁদিয়া পড়িল। সেই সব জানাইয়া বলিল—মুকুর্জী তুমি আমাকে রক্ষা কর।

আমার করুণাও হইতেছিল, আবার ভাবিতেছিলাম এমন ঘৃণ্য লোককে কেন সাহায্য করব?

চ্যাটারসন করুণা ভিক্ষা করিয়া বলিল—মিষ্টার মুকুর্জী!

পার্স চ্যাটারসনের কাহিনী

কঠিন হইবার চেষ্টা করিয়া আমি বলিলাম—আমি এর কি করতে পারি—মিষ্টার চ্যাটারসন ?

পার, তুমি পার মুকুর্জী। যারা দরখাস্ত করেছে—তাদের দরখাস্তখানা প্রত্যাহার করতে রাজী করে দাও তবে আমি বেঁচে যাই। আমি তাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতেও রাজী আছি। জ্ঞান, মুকুর্জী, আমি জীবনে একটা লঙ্কর নিয়ে বেঁচেছি। আজ চার বৎসর দ্বী-কন্ডার মুখ দেখি নাই। আমার সে লঙ্কর পূর্ণ হতে আর বেশী বিলম্ব নাই। বড় জোর ছ-মাস। তার আগে চাকরীগেলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হুবে।

লোকটার কাতব মিনতিতে তাহাকে সাহায্য না করিয়া পাবিলাম না। চ্যাটারসন সে বাত্মা বাঁচিয়া গেল। আমাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়াও তাহার তৃপ্তি হইল না—কেমন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে খুঁজিয়া যে যেন পাগল হইয়া উঠিল। আমি সেদিক হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য—প্রলঙ্কান্তরেব অবতারণা করিলাম। আমার বিবাহের সংবাদটা তাহাকে দিয়া বলিলাম, আমি যে বিয়ে করছি মিষ্টার চ্যাটারসন ! তুমি বরষাত্রী বাবে ?

সে খুব খুশী হইয়া উঠিল—বলিল, সত্যি বলছ মিষ্টার মুকুর্জী ?

—সত্যি। আর জ্ঞান আমি তোমার কথাই রেখেছি, বিনা পণেই বিবাহ করছি।

চ্যাটারসন অভিজুতের মত চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ খাটি বাংলার বলিল—দীর্ঘজীবী হও মিষ্টার মুকুর্জী। দাম্পত্য জীবনে তুমি সুখী হও।

তার চোখের কোণে জল দেখা গিয়াছিল, রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া সে হাসিয়া বাংলাতেই বলিল—ভাবী বধু নিশ্চয় খুব সুন্দরী।

গাড চ্যাটারসন আৰু কাহিনী

পুলকিত অন্তরেই জবাব দিলাম—সত্যই বাকে সুন্দরী বলে।
কিন্তু তুমি বাংলা জান দেখছি।

মিঃ চ্যাটারসন লজ্জিতভাবেই স্বীকার করিল—জানি। বলেছি
তো—তোমাদের বাঙালী ঘরের সঙ্গে আমার ছেলেবেলা থেকে মেলামেলা
ছিল। আমার বন্ধুর কথা তো বলছি। লালপেড়ে শাড়ী পরে কুমারী
সুন্দরী মেরেরা টুণে বার মুকুর্জী—আমার মনে পড়ে বার আমার বন্ধুর
মেরেকে। ওঃ—তেমনি সুন্দরী—তেমনি লক্ষ্মী শুউ যেন তোমার হয়।

* * *

সত্যই ভাবীবধু আমার সুন্দরী। আমাব মাসীমা সখক করিয়াছেন,
বধুব জননী মাসীমার প্রতিবেশিনী। নিত্যন্ত হুঃহু অবস্থার ঘর—মা
নিজে ভাত রাঁধিয়া জীৰিকা নিকাহ করেন। মেরেটির বাপ থাকিয়াও
না থাক। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেছেন।

মেয়ে দেখিয়া মাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌দান করিয়া
তিনি বেশে ক্রিয়া বিবাহের উত্তোগে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

বিবাহ যে দিন করিতে গেলাম সেদিন চ্যাটারসন বলিল মুকুর্জী,
ফেরবার সময় কিন্তু আমার অন্তে একটা বিলিতি মধের পাইট এনো।

আমাব পরিতৃপ্ত পুলকিত মন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল
না। বলিলাম, নিশ্চয়। আর আমাদের বউভাতে তোমার নেমন্তন্ন
রইল।

সে বলিল—নিশ্চয়—নিশ্চয়। কি বলে—তোমাদের সেই চক্কড়ি
খেতে আমি খুব ভালবাসি। আর একটা মাছের মাথা খাওয়াতে হবে।
হালিয়া বলিলাম—নিশ্চয় খাওয়াব।

গাড় চ্যাটারসনের কাহিনী

সেদিনও তাকে একটা টাকা দিলাম। সে ম্যান হাউসে গেল।
এবার বাংলাতেই বলিল—আমি অত্যন্ত হতভাগ্য বুকুজী! তুমি আমার
কথা রাখলে, বিনা পণেই বিবাহ করছ তুমি, আর আমি—তোমার কথা
রাখতে পারলাম না। মর ছাড়তে পারলাম না।

বধুর নাম উমা।

বিবাহ শেষে আমার শাওড়ী কাঁদিয়া বলিলেন—বাবা, তুমি আমার
দেবতার চেয়েও বড়! তোমার মা আমার কাছে লাক্ষা ভগবতী।
জান বাবা বড় মেয়ে আমার এই বিয়ে না হওয়ার জন্তে আত্মহত্যা
করেছে। কেউ জানে না সে কথা! তোমার মাসীমাও জানেন না।
কিন্তু তোমার কাছে গোপন করব না। সে আমার অনেক দুঃখ।

বিদায় লইয়া উমা কাঁদিতে লাগিল, সে কান্না তাহার আর
ধামে না।

হাওড়া স্টেশনে আসিয়া চ্যাটারসনের কথা মনে পড়িল, কেলনার
হইতে একটা পাইট হইল কিনিয়া লইলাম।

ব্রাহ্ম লাইনের অংশনে নামিয়া চ্যাটারসনের খোঁজ করিলাম।
সে তখনও আসে নাই। বরষাত্রীরা ছড়াইয়া কয়েকখানা গাড়ীতে
উঠিল। উমাকে লইয়া আমি একখানা লেকেওক্সালে উঠিলাম।

টিকিট করিয়া গাড়ীতে উঠিতেছিলাম—এমন সময় শুনিলাম—হ্যালো-
মিস্টার-বুকুজী! চ্যাটারসনের কণ্ঠস্বর।

ফিরিয়া বলিলাম—এস এস তোমার জিনিষ এনেছি।

সে পরম আনন্দভরে বলিল, লং গির্ড হাই বুকুজী এ্যাণ্ড মিসেস
বুকুজী! কিন্তু বউ বেথাবে না তোমার?

ডাকিলাম—এস।

গাউ চ্যাটারসনের কাহিনী

গাড়ীর বরষা খুলিয়া তাহাকে ডাকিলাম। ব্যাগ হইতে বোতলটা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে গিয়া অবাক হয়ে গেলাম।

চ্যাটারসনের চোখে সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি উমার চোখেও ভালিয়া উঠিয়াছে তাহারই প্রতিবিশ্ব, দ্রুতনেই থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

অকস্মাৎ উমা বলিয়া উঠিল—বাবা।

চ্যাটারসন হ-হ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—মা—টমা। উনি আমার উমারাণী!

* * *

জন আর্ডেন চ্যাটারসন নয়—জনার্দন চট্টোপাধ্যায়—উমারই নিকৃষ্টি পিতা।

সেই গাড়ীতে এসিয়াই তিনি বলিলেন—বাবা অরুণ, বেধিন বড় মেয়ে রমা বিয়ে না হওয়ার লজ্জায় আত্মহত্যা করলে—সেদিন পূর্ণগল হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর—চাকরীর খোঁজে—কত ঘুরলাম—কিছু হ'ল না। শেষে এক পানরী বললে—তুমি যদি কুশান হও তবে তোমাকে চাকরী করে দিতে পারি। ভাবলাম—কি হবে আমার জাতে? কুশান হলাম। এই গার্ডগিরি চাকরী নিলাম। প্রতি মাসের মাইনেটি আমি জমা করে বাড়ি আমার উমার বিয়ের দ্বন্দে। গুরুত্ব ছিল হাজার টাকা হ'লেই টাকাটা উমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে—বাস করে দেব এবারের পালার। মদ না খেয়ে থাকতে পারতাম না। তাই ভিক্ষে করেছি তবুও এ টাকা থেকে এক পরশা ভাঙিনি। আমি কিরীড়ী নই এ কথা একদিনও কাউকে জানতে দিইনি। মাতৃত্বাবার আদ্য তিন বৎসর কথা কইনি। উঃ!

গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী

উমা ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতেছিল। উমার বাবা বলিলেন উমাকে একবার বুকে নেব অরুণ?

আমিও কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলাম—আমায় জিজ্ঞেস করছেন সে কথা!

ট্রেনটা আমাদের ষ্টেশনের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। বলিলাম—আসবেন তো বউভাতের দিন।

তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—না—না—না। ও কথা বলো না। এতটুকু লজ্জাবোধ মর্যাদাবোধ আমার আজও আছে।

ট্রেন থামিতেই তিনি উমাকে বলিলেন—কাঁদিসনে উমি। তোর ভাগ্য মা উমারাগীর মতই। খবরদার একথা ঘুণাঙ্করে প্রকাশ করবি না। আমার অরুণের মাথা হেঁট না হয়!

যাইবার সময় বোতলটাকে তুলিয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিলেন।

* * *

পরদিনই লংবাথ পাইলাম—গার্ড চ্যাটারসন নিরুদ্দেশ।

কয়দিন পর আমার কাছে একথানা ইনসিওর আসিল—নয়শত বাট টাকার। উমার বিবাহের যৌতুক।

সাবিত্রী চুড়ি

ঠিক হইল গ্রামের ও নিকটবর্তী গ্রামগুলির প্রত্যেক ভদ্রলোককে মাসে চারিখানা করিয়া রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড লিখিতেই হইবে। অপরাপর চাষী কামার ছুতার গৃহস্থকে লিখিতে হইবে দুইখানি রিপ্লাই কার্ড; নিতান্ত হীন অবস্থার লোকজনকে বাধাই দেওয়া হইল। রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড ছাড়া অন্য প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখা যথা নিয়মে তো চলিবেই।

ব্যাপারুটা হইল হারানন্দপুর গ্রামে পোষ্টাফিস স্থাপনের উদ্যোগপূর্বক। অনেকখানি স্থান লইয়া এই অঞ্চলটায় পোষ্টাফিসের বড় অসুবিধা; প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্তী শহরে পোষ্টাফিস স্থাপিত; সপ্তাহে দুইটা দিন বিট—ছোট ছোট গ্রামগুলোয় তাও নাই, সেখানে সপ্তাহে ছয়দিন অপেক্ষায় পর সাতদিনের দিন পত্র আসে। এ ছাড়াও একটু গ্রাম—সেই মান-সম্মানের ব্যাপারও আছে। পশ্চিমে তিন ক্রোশ দূরবর্তী নবাবপুর ছোট একখানা এতটুকু গ্রাম—সেই গ্রামের অমর বাড়ুজ্জি অকস্মাৎ আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া গ্রামে একটা পোষ্টাফিস বসাইয়া ফেলিয়াছে। অথচ হারানন্দপুর বড় গ্রাম—গ্রামে বহুশিক্ষিত কায়স্থ সমাজের বাস—সে গ্রামে পোষ্টাফিস নাই! কেহই টিকারী না দিলেও সকলের মাথা আপনিই হেঁট হইয়া গেল। সকলে মাটিং করিয়া উপরোক্ত প্রস্তাব আইন রূপে গ্রহণ করিয়া ডাক-বিভাগে পোষ্টাফিসের জন্য একটা দরখাস্ত করিয়া বসিল।

সাবিত্রী চুড়ি

ডাক-বিভাগও যথাসময়ে যথানিয়মে উত্তর দিল—‘পরীক্ষা-গ্রহণীয়’ হিসাবে অর্থাৎ ‘এক্সপেরিমেন্টাল’ পোস্টাফিস মঞ্জুর করা হইল। ছয়মাস পর পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া ফল সন্তোষজনক হইলে যথারীতি ব্রাঞ্চ পোস্টাফিস দেওয়া হইবে। ছয়মাস এখন কত, চিঠি, যাত্রা এবং কত চিঠি আসে তাহার হিসাব রাখা হইবে। তাই চিঠির সংখ্যা সন্তোষজনকের উপরে তুলিবার জন্য ওই রিপ্লাই কার্ড লিখিবার আইন জারী হইল। সিংহ বাবুরা একথানা ঘর ছাড়িয়া দিলেন, উচ্চপ্রাইমারী পাঠশালার ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করা পণ্ডিতও বিনা বেতনে কয়েক মাস পোস্টমাষ্টারী করিতে রাজী হইল; কিন্তু পিওন লইয়াই সমস্তা হইল, সমুদ্র পার হইয়াও গোলন্দ পার হওয়াই হইল সমস্তা। পিওন কোথা পাওয়া যায়? বিনা বেতনে কে এ কাজ করিবে? লেখাপড়া জানা লোক চাই; কাজটিও নেহাৎ হাওয়া-খাওয়া কাজ নয়, রীতিমত ছুপুরের রোজ মাথায় করিয়া দৈনিক কয়েক মাইল ঘুরিয়া আসিতে হইবে।

সিংহবাবু বলিলেন গাঁয়ে বেকার ছেলের ত অভাব নাই, কিং তারা কি একাজ করবে? বিষ না থাকলে হবে কি কুলো-পানা চক্র-যে আছে, সব। প্রবীণ মিত্র মহাশয় এককালে সরকারী চাকুরে ছিলেন, এখন পেন্সন পান। তিনি আধুনিক মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি; তিনি হরি চাটুজ্যেকে বললেন—চাটুজ্যের ছেলে এন্টাঙ্গ ফেল করে বলে রয়েছে! লাগিয়ে দাও না চাটুজ্জে, মাইনে ছ’মাস পরে হবে তো!

চাটুজ্জে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া গেল, এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল—আপনার মেজনাতি তো খার্ড কেলাল থেকে পড়া ছেড়ে এসে ঘরে বলে তাস পিটছে, তাকেই লাগিয়ে দিন না। হবে তো মাইনে! সরকারী চাকুরীও বটে, পেন্সনও আছে!

সাবিত্রী চুড়ি

সমস্ত মজলিসটা অন্তরূপ ধারণ করিল; আলোচনা—আলাপ সমস্ত শুক হইয়া গেল—আশ্রয় ঝড়ের পূর্বসংকেত ঘনায়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু সোভাগ্যের কথা ঝড় উঠিল না। মিত্র মহাশয় কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া চাটুজ্ঞা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপরদিক দিয়া চাটুজ্ঞাও প্রস্থান করিল। তারপর একে একে সকলেই। সর্বশেষে সিংহবাবু বলিলেন—তাহলে সভাপতিকে ধন্যবাদটা—কিন্তু ধন্যবাদ দিবার কেহ ছিল না। গ্রামের সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছিলেন সভাপতি। তিনি বলিলেন—থাক থাক। ও আর এমন কি!

* * * *

এমন সমস্তার কিছু দুইদিন পর অকস্মাৎ অত্যন্ত সহজে সমাধান হইয়া গেল। গোবিন্দ বৈরাগী আসিয়া সিংহবাবুকে প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে বাবু, আমাকে চাকরীটা দেন কেনে।

—চাকরী? বিস্মিত হইয়া সিংহবাবু বলিলেন—চাকরী? চাকরী তো এখন কিছু নাই বাপু! চাকর বাকর তো আর আমার দরকার নাই।

—আজ্ঞে না, চাকরের কাজ নয়, ওই ডাকঘরের পিওনী।

—পিওনের কাজ? সিংহবাবু হাসিলেন। গোবিন্দ বৈরাগী ভিক্ষা করিয়া খায়, নিরক্ষর বৈষ্ণবের ছেলে, লোকটার মাথায় একটু ছিটও আছে। বাবু হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু মাইনে যে নেই গোবিন্দ।

গোবিন্দ হাত জোড় করিয়া উত্তর দিল—আজ্ঞে হবে তো।

বাবু কহিলেন—সে তো পরে। এখন থাকে কি? ভিক্ষা করবে, না পিওনী করবে?

সাবিত্রী চুড়ি

—আজ্ঞে চুইই বরষ। ভিক্ষা করতে তো গাঁয়ে ফিরতেই হয়।
তা—এক কাঁখে থাকবে ভিক্ষার ঝুলি, এক কাঁখে থাকবে চিঠির ঝুলি।

—এটা ভাল বলেছ গোবিন্দ! কিন্তু লেখাপড়া জানা লোক চাই
যে! চিঠির ঠিকানা পড়তে হবে তো! রামের চিঠি শ্রামকে দিলে তো
চলবে না।

—আজ্ঞে লেখাপড়া আমি কিছু কিছু জানি ছুঁর!

—জান? বাবু এবার প্রত্যাশায় গম্ভীর হইয়া আস্তরিকতার সহিতই
প্রশ্নটা করিলেন এবং একটু সজাগ হইয়া বলিলেন।

আজ্ঞে হাঁ—উচ্চগ্রাহমারী পর্য্যন্ত পড়েছি আমি পাঠশালায়। বাবা
চাবরী করতেন কিণীহারে—লেখানে আমি পড়েছি বাবুদের পাঠশালায়।
বিস্মিত হইয়া বাবু বলিলেন—হঁ। আচ্ছা—পড়তো দেখি এই
কাগজটা!

গোবিন্দ অবলীলাক্রমে পড়িয়া গেল—আনন্দ-বাংলার পত্রিকা,
ব্রহ্মপতিবার উনিশ শো সাঁইত্রিশ।

বাধা দিয়া বাবু বলিলেন—ছাপা লেখা তো হবে না। হাতেরলেখা,
আচ্ছা পড়—এই ঠিকানটা পড়।

গোবিন্দ পড়িল—মহামহিম মহিবান্ধব—শ্রীযুক্ত শঙ্কর প্রসাদ সিংহ—
জামিদার বাবু মহাশয় বরাবরেষু।

—বাঃ—বাঃ। তাই তো গোবিন্দ তুমি যে এমন লোক—তা তো
জানতাম না হে! এঁরা—এষে গড় গড় করে পড়ে গেলে। বেশ হবে,
দ্রিক হবে।

গোবিন্দ প্রশংসায় পরিকুপ্ত হইয়া সলজ্জভাবে হাঁসিয়া নীরবেই
সাঁড়াইয়া রহিল। বাবু আবার একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কথাটা

সাবিত্রী চুড়ি

হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেছে। তিনি বলিলেন—কিন্তু সব চিঠিই তো বাংলাতে ঠিকানা লেখা থাকবে না। ইংরেজী ঠিকানার চিঠি পড়বে কেমন করে ?

গোবিন্দ* তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—আজ্ঞে—পোষ্টমাষ্টার বাবু বলে দেবেন, আমি পেনসিল দিয়ে বাড়ীলাতে লিখে নেব ঠিকানা খামের ওপর।

বাবু মহাখুসী হইয়া বলিলেন—তুমি ঠিক পারবে গোবিন্দ ! ঠিক পারবে ! বেশ, তাই কাজ আরম্ভ করে দাও তুমি—ভালই হবে তোমার। ভবিষ্যতেতো ভালই হবে—পিওনীর আরম্ভই হল বোলটাকা মাইনেতে, কি আরও বেশী বোধ হয় আজকাল।

গোবিন্দ বলিল—ইংরেজী-ও তা করতে শিখে নোব আমি।

গোবিন্দ হাসিতে হাসিতে আসিয়া উঠিল লক্ষ্মী বৈষ্ণবীর বাড়ী—।
লক্ষ্মী প্রশ্ন করিল হাসছ যে ?

—হাসছি।

—ওই কথা শুনলে আমার সমস্ত গা জলে যায়। হাসছ যে ? না হাসছি। তা সে হাসি আমাকে দেখান কেন ? ওই মাঠে গিয়ে হাস গে।

গোবিন্দ পুলকিত হইয়া উঠিল। সে এবার বলিল—এবার আর তোমার ‘না’ শুনছি না। আমার চাকরী হল।

—চাকরী ? লাটসাহেবী নাকি ? লাটসাহেব বেলাত যাবে, তাই তোমাকে চাকরীটা দিবে যাবে নাকি ?

—লাটসাহেবী নয়—তবে পিওনী বটে। এর পরে পোষাকও হবে। পেনটুল কোট পাগড়ী, পায়ে পটি না বলে তাই। মাইনে হবে কুড়িটাকা মাসে। বছরে বছরে বাড়বে।

সাবিত্রী চূড়ি

—মাইনে হবে। হয় নাই এখনও। গাছে কাঁঠাল গৌকে তেল।
তা বেশ, মাইনে হোক—তারপর হবে।

অর্থাৎ বিবাহ। লক্ষ্মী গোবিন্দের বাল্যসখী নয়, তবে বাল্য
কালে তাহাদের বিবাহের একরূপ স্থির হইয়াছিল। অকস্মাৎ
একদা সে সম্বন্ধ ভালিয়া যায়। লক্ষ্মীর এক মামা ছিল
শহরে বৈরাগী। সে কাজ করিত রেলের এক অংশনে। সে একদিন
আসিয়া লক্ষ্মীকে দেখিয়া প্রস্তাব করিল, একটি পাত্র আছে ভাল। সে
ভাল ঘেরে চায়। দেবে বিয়ে? ছেলেটি চাকরী করে রেল, গাড়ীর
নয়র লেখে। পঁচিশ টাকা মাইনে। তা ছাড়া তোমার জিনিষপত্র
কিনতেই হয় না; রেলের মালতো। সে এক বিচিত্র হাসি
হাসিল।

লক্ষ্মীর মা সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। চুকুরে বরেই
বিবাহ দিয়া সে কল্লার সঙ্গেই জামাতাব বাড়ী বাস করিতে চলিয়া গেল।
গোবিন্দ তখন পিতার মৃত্যুর পর পিতার চাকরীতে বাহাল হইয়াছে।
কির্ণাহারের বাবুর বাস খানসামা। সংবাদটা শুনিয়া গোবিন্দ চাকরীটাই
ছাড়িয়া দিল। বৈরাগীর ছেলে—কাঁধে খুলি লইয়া জাতি ব্যবসা আরম্ভ
করিল। সেই ব্যবসা তাহার আজও চলিতেছে।

দশ বারো বৎসর পর লক্ষ্মী একদিন বিধবা হইয়া দেশে ফিরিল।
লক্ষ্মীর মাও তখন মারা গিয়াছে। গোবিন্দ লক্ষ্মীকে দেখিয়া অবাচ
হইয়া গেল। সেই লক্ষ্মী-এই। রূপ-ধৌবনে সমুদ্রা লক্ষ্মীর পরনে ধপধপে
মিহি পাড় ভূতি-হাতে একগাছি করিয়া বোধ হয় সোণারই চূড়ি। মাথার
চুল বেগী করিয়া না বাধিলেও পরিপাটি ছাঁচে বিভক্ত। গোবিন্দ লক্ষ্মীর
পায়ে আপনাকে বিকাইয়া দিতে চাহিল। কিন্তু লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল—

সাবিত্রী চুড়ি

গোবিন্দকে, কিনিবার মত কানাকড়ি তাহার ভাগারে নাই। সে বলিল—
—ভিখারীর আবার বিয়ের সাধ কেন ?

গোবিন্দ সবিনয়ে বলিল—আমি চাকরী করব লক্ষ্মী। আমি গেলেই
বাবু আমাকে কাজ দেবে।

—কি থানসামাগিরি। লক্ষ্মীর চোখ দুইটা কৃত্রিম বিষয়ে বিফারিত
হইয়া উঠিল।—ওরে বাপরে এত বড় চাকরের পরিবার আমি হতে
পারব না! বলিয়া সে যে হাসি হাসিল, সে হাসি অত্যন্ত নির্দমভাবেই
গোবিন্দকে আঘাত করিল। গোবিন্দ আর দুইমাস লক্ষ্মীর বাড়ী হাটিল
না। দুইমাস পর আবার সে একদিন আসিয়া বলিল আচ্ছা লক্ষ্মী, আমি
যদি চাষ বাস করি ?

লক্ষ্মী প্রশ্ন করিল—টাকা ?

—টাকা আমার কিছু আছে।

—কত সেইটা শুনি না কেন ?

—শে। আড়াইয়েক টাকা আছে।

—আড়াই শে। আমি হবে আড়াই বিঘে। তার ধানে আমি খাব
তুষ, আর তুমি ভাত নাকি ? না, আমি খাব, তুমি তুষ খাবে ? বলিয়াই
আবার সেই হাসি। তারপর সে স্পষ্টই বলিয়া দিল—দেখ এ জম্মে আর
হয় না। কি করব বল আমার চাল চলন তো দেখছ। আমি বাপু ভাল না
হলে খেতে পারি না—ভাল না হলেও পরতেও পারি না। আজ গোবিন্দ
তাই হা'সতে হাসিতে আসিয়া লক্ষ্মীর প্রশ্নের উত্তরে বলিল—হাসছি।

কিন্তু সংবাদটা গ্লাইয়াও লক্ষ্মী তাহাকে লাগ্রহে লক্ষ্যতি দিল না।
‘বলিল তা’ বেশ মাইনে হোক। হবে তারপর।

গোবিন্দ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল না। এত দীর্ঘ দিন সে অপেক্ষা

সাবিত্রী চুড়ি

করিয়াছে, আর তো ছয়টা মাস। বেশ তাই, তারপরই হবে। সে শুধু বলিল—কিন্তু সেদিন তো আর না বলবে না ?

এবার লক্ষ্মী আর পরিহাস করিল না, বলিল—না।

হরিপদ হাজরা, ঘোষপুর। কাঁচা ইংরেজী হাতের লেখা—হাজরার ছেলের চিঠি। ছেলেটি আমেদপুর জুলে পড়ে, বোর্ডিংএ থাকে। ঠিক তাই। এই যে লিখিয়াছে শ্রীচরণ কমলেশু। টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছে।

দ্বিপ্রহর রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া মাঠের একটা পুকুরের ধারে একটা গাছের তলায় বসিয়া গোবিন্দ চিঠিগুলি দেখিতেছিল। সমস্ত চাকলার সংবাদটা এখন তাহার নখদর্পণে। সে লুকাইয়া লুকাইয়া মাঠে বসিয়া এমনি করিয়া পোষ্টকার্ডের চিঠিগুলি পড়ে। খামের চিঠিগুলির উপর তাহার দারুণ কৌতূহল—কিন্তু ভরে শেগুলি খুলিতে পারে না।

ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—রতনডাঙ্গা। নিশ্চয় মামলার চিঠি। উঃ লোকটার এত মোকদ্দমাও আছে। দেশের সর্বনাশ করিয়া দিল। শ্রীরাম ঘোষের মত অবস্থাপন্ন চাষী ভট্টাচার্য্যের পাঁচশত টাকা ধানের দ্বায়ে সর্বস্বান্ত হইয়া গেল। এ আবার কার সর্বনাশ আরম্ভ করিয়াছে। উঃ উকিলের লেখা বটে। বহু কষ্টেই গোবিন্দ পড়িল—নন্দলাল গোপের মামলার দিন আগামী ১২ই তারিখ আছে। অবশ্য অবশ্য ৫৭ টাকা খরচ লই আসিবেন। পরামর্শমত সমন চাপিয়া দেওয়া হইয়াছে। একতরফা ডিক্রী হইবেই।

সর্বনাশ। গোবিন্দের ইচ্ছা হইল চিঠিখানা হিড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু...। না-সে হয় না। চাকরী চলিয়া যাইবে। নন্দকে খবরটা গোপনে দিলে কেমন হয় ? গোবিন্দ উপায় পাইয়া খুসি হইয়া উঠিল। নন্দর গ্রামেতে যাইতেই হইবে। ছুইখানা চিঠি আছে। রতীন খামের

সাবিত্রী চুড়ি

চিঠি, একটু মিষ্টি গন্ধও পাওয়া যায়। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী। তাহার মনশ্চকুর সম্মুখে একটু সলজ্জ অবগুষ্ঠিতা বধূর মূর্তি ভাসিয়া উঠিল। ঠিক আজ যে দরজার আড়ে দাঁড়াইয়া আছে—সম্মুখে তাহার পাঁচ বছরের ছেলেটি। তাহাকে দেখিলেই বলিবে—পিওন আমাদের চিঠি ?

চিঠি লইয়াই বলিবে, দাঁড়াও ভিক্ষে নিয়ে যাও। অন্ততঃ একমাসের চাল আনিয়া সে চালিয়া দেয়। প্রত্যেক বিটে তাহার চিঠি থাকিবেই—কোন কোন বিটে তাহাব ছই খানাও থাকে। যুবক স্বামীটি একদিনে পাইবে আনিয়াও উপর্যাপবি চিঠি দিয়া বসে। আজও ছই খানি চিঠি আসিয়াছে। পিওনের পদে পাকা হইলে সেও তো মাঝ এক স্থানে থাকিবে না; এখান ওখান বদলী করিবেই। তখন সেও পত্র লিখিবে লক্ষ্মীকে। শ্রীমতীলক্ষ্মীমনি দাসী, কেয়াংক—গোবিন্দজি দাস, ভিলেজ এণ্ড পোষ্ট হবানন্দপুর। ইংবেঞ্জী তাহার অনেকটা আসিয়াছে, নিজের নাম সে বেশ লিখিতে পারে। আর এই ছইটা মাস বাইতে—বাইতে ঠিকনা পড়িতে ঠিকানা লিখিতে সে বেশ পারিবে। ফাষ্টবুক এবার শেষ হইরাছে—আবারও অর্কেকের উপর সে পড়িয়া ফেলিয়াছে। সে মনে মনে বানান করিতে আরম্ভ করিল ‘শ্রীমতী লক্ষ্মীমনি দাসী’। কিন্তু লিখিবে কি ? শুধু আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ ?

অকস্মাৎ তাহার মনটা এই রঙীন খাম ছইটির অভ্যস্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা যেন মাথা কুটিতে আরম্ভ করিল। চিঠি ছইখানা বাহির করিয়া একদৃষ্টে চিঠি ছইখানার দিকে সে চাহিয়া রহিল। চট করিয়া তাহার মনে হইল—প্রথম চিঠিখানা এই ছয় তারিখের ছাপ মারা, চিঠিখানা না দিলেও তো চলে। এই তো আট তারিখের চিঠিতেই তো

সাবিত্রী চুড়ি

সব খবর আছে ! সে আর থাকিতে পারিল না, চিঠি খান্না খুলিয়া পড়িল।
স্বল্প বিবর্ণ রক্ত দ্বিপ্রহরটা যেন তাহার চোখের সম্মুখে বর্ণে বৈচিত্রে রূপে
রসে অপরূপ হইয়া উঠিল। ‘প্রাণের সাবিত্রী’ !

গোবিন্দ চোখ বুজিয়া লেখক ও পাঠিকার অপূর্ণ ভালবাসার রসধারা
চুরি করিয়া পান করিয়া আবেগে বিভোর হইয়া গৈছে।

কিছুক্ষণ পর সে উঠিল। গ্রাম গ্রামান্তর ফিরিয়া নন্দকে সংবাদ
দিয়া ওই সাবিত্রীদেবীর বাড়ীর দিকে পথ ধরিল। কিন্তু ভয়ে
অমুশোচনায় তাহার পা যেন চলে না।

—পিওন আমাদের চিঠি ?

গোবিন্দ বিবর্ণ মুখে একখানি চিঠি তাহার হাতে দিল। চিঠি দিয়াই
সে চলিয়া বাইতেছিল। ছেলোট বলিল—দাঁড়াও চাল নিয়ে যাও।
বাধ্য হইয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। ওই মেয়েটি চিঠি পড়িতেছে ! সে
ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

ছেলেটি চাল আনিয়া ঢালিয়া দিল। গোবিন্দ দ্রুতপদে ফিরিল।

—পিওন ! ও পিওন !

গোবিন্দের কর্ণ শুকাইয়া গেল, সে উত্তর দিতে পারিল না, কেবল
ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

—শোন শোন ! মা ডাকছে আমার।

গোবিন্দ স্তনিল চাপাগলায় মা তিরস্কার করিল—ছেলের আঁকল
মেথ—ওই কথা বলতে আছে ? বল—যা বলতে বললাম তাই
বল।

ছেলেটি বলিল—অলখাবার নিয়ে যাও। আমার বাবার মাইনে
ষেড়েছে কি না। একদিন ভাত খাবার নিমতন্ন রইল তোমার।

সাবিত্রী চুড়ি

গোবিন্দ পূর্ণ আশ্বিনের একটা নিখাস ফেলিল, বোকা মেয়েটা ধরিতে পারে নাই।

* * * *

ছরমাস পূর্ণ হইতে আব পনের দিন বাকী আছে। পাকা পিওনী ব পদের অল্প দরখাস্তও হইয়া গেছে—দুইশত টাকা জামীনও সে অমানত করিয়া দিয়াছে। আর লক্ষ্মীর ‘না’ বলিবার পথ নাই। লক্ষ্মী বলিল, চৈত্র মাসে তো আর হয় না। বোশেখের প্রথমেই তা হ’লে দিন ঠিক কর।

গোবিন্দ পাঁজী দেখিয়া রাধিয়াছে, সে বলিল—কাষ্ট বৈশাখ ভেরী শুভ ডে।

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল একেবারে রাম পণ্ডিত। বাঙলা করিয়া বল না!

—১লা বৈশাখ—খুব ভাল দিন।

—একেবারে পয়লাই। লক্ষ্মী হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল।

—আচ্ছা—লগাম। চিঠি ক’খানা দিবে আসি। গোবিন্দ বাহির হইয়া পড়িল।

সেই ঝটতলাটিতে বস। যেন তাহার একটি নিয়ম হইয়া গেছে। ঝটতলাতে বসিয়া তেমনি চিঠি দেখিতে দেখিতে বাহির করিল সাবিত্রী দেবীর চিঠি। এ চিঠির এখন সে নিয়মিত পাঠক। জল দিয়া ভিজাইয়া খামখানি খুলিয়া সে পড়ে—চিঠির কাগজে কালির অক্ষরে বেরসটুকু থাকে—লেটুকুর প্রলোভন সে কিছুতেই সমরণ করিতে পারে না। পড়িয়া ব্যাগের ভিতরে রক্ষিত লিপি আটা একটি আটার শিশি বাহির করিয়া খামখানি সব্বন্ধে পূর্বের মত আটয়া ফেলিয়া—চিঠিখানি বিলি করিয়া আসে। আজিকার খামখানি পূর্বাগরগুলির মত নয়। এখানায় বেশ ভাল খাম। স্বামীটি বেনারস গিয়াছে—কার্য্যোপলক্ষ্যে। বেনারসেরই

সাবিত্রী চুড়ি

ছাপ। তাই বোধ হয় নতুন স্থানে পূর্বাপর খামের মত খামে মেনে নাই।
খামখানার মধ্যে সে সুমিষ্ট গন্ধও নাই—কেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা তীব্র গন্ধ।
সে পুরুর ঘাটে নাঁঘিয়া খামখানার আঠা মুখটুকু ভিজাইয়া দিল। দেখিতে
দেখিতে খামের অলসিত মুখ ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল। গোবিন্দ সম্ভরণে
একটি বেশলাইয়ের কাঠি দিয়া চিঠিখানা খুলিয়া চিঠিখানা বাহির করিল।
সেদিন লোকটি লিখিয়াছিল, “এবার চুড়ি গড়াইয়া লইয়া বাইতেছি,
চুড়ির নামও ‘সবিত্রী চুড়ি’; আবার কিছুদিনের মধ্যেই আর একখানা
ধূতন গহণা দিব; ছোটখাট একটি জিনিষ, কি পছন্দ লিখিবে। কান্দি
ধাইতেছি কাজে—সেখান হইতে আনিব লিখিবে। “সাবিত্রীর সাবিত্রী
চুড়ি” সে দেখিয়াছে সেদিন ধোকা ছিল না, দরজার আড়াল হইতে
সোনার চুড়ি পরা নিটোল হাতখানি বাহির হইয়া আসিয়াছিল। লক্ষ্মী
প্রতিহার মত ঘেরে, সোনার চুড়িতে তাহাকে বড় সুন্দর মানাইয়াছে।
এবার কি গহণা হইবে? সে যেন এই প্রণয়ীঘৃণলের বাঁশ্যবহ দূত—পরম
অন্তরঙ্গ আপনার জন হইয়া গেল। গোবিন্দ চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল।
এ কি! এ কাহার চিঠি? একি সন্ধান? ‘মহাশয়া!’ কল্পনাসে
চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে গোবিন্দ অমুত্তব করিল, কে যেন তাহার
পলাটা টিপিয়া ধরিয়াছে—সমস্ত চেতনা তাহার বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।
নাই! হরনাথ চক্রবর্তী নাই! “আপনার স্বামী হরনাথ চক্রবর্তী
এখানে আসিয়া কলারায় আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে আসেন। কিন্তু
অত্যন্ত দুঃখের কথা—চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই। গতকল্য সন্ধ্যার
সময় তিনি দ্বারা গিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে আপনাদিগকে তিনি সংবাদ
দিতে বলিয়াছিলেন, সেই সংবাদ অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাকে
জানাইতেছি।”

